কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

অক্টো-নভে ৮৩

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সুজিত কুণ্ডু
স্ক্যান করেছেন - সুজিত কুণ্ডু
এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কারোর কাছে যদি কোন পত্রপত্রিকার কোন বিশেষ সংখ্যা থাকে এবং আপনি সেটা আমাদের স্ক্যান করতে দিতে চান কিংবা নিজে স্ক্যান করে দিতে চান তাহলে নিচের ইমেইল এ যোগাযোগ করুন

dhulokhela@gmail.com

সোনা
দিয়ে
বোনা

একটা সময় গেছে যখন এক টুকরো মসলিনের জন্যে
রোমের রাণী কিংবা মিশরের রাজা
সাগ্রহে অপেক্ষা করতেন।
ইতিহাসের সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলার
তাঁতে বোনা শাড়ির বিশ্বজয়।
শুধু শাড়ি নয়, যে কোন হস্তশিল্প, তা যদি হয় মেঝেতে
পাতার মাদুর কিংবা ঘর সাজানোর পুতুল অথবা
গায়ে পরার গয়না, কাঁধে ঝোলানোর ব্যাগ—
সবই প্রাণ পায় বাংলার দক্ষ কারিগরদের ছোঁয়ায়।
বাংলার তাঁতের কাজ কিংবা হাতের কাজ
যাই-ই কিনুন তা শুধু হয়ে উঠবেনা, ঘরের অলঙ্কার,
আপনার শিল্পবোধকেও প্রকাশ করবে
তার অনুপম সৌন্দর্য।
আজই চলে আসুন——
তাঁতবস্ত্রের জন্য, 'তন্তুজ' অথবা 'তন্তুশ্রী'-তে
হস্তশিল্পজাত সামগ্রীর জন্য—'মঞ্জুষা' এবং গ্রামীণ
বিপণিগুলিতে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি 8650/83

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

3য় বর্ষ 7ম সংখ্যা
অক্টোবর-নভেম্বর 1983
প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল

শারদোৎসব শেষে তোমাদের সকলকে আমাদের অন্তরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশাকরি পুজোর দিনগুলি তোমাদের আনন্দেই কেটেছে। এবার স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা সামনে, সকলে ভালোভাবে প্রস্তুত হচ্ছ নিশ্চয়।

4 নভেম্বর থেকে নয়াদিল্লীর ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের উদ্যোগে কলকাতা ময়দানে প্রথম জাতীয় শিশু মেলা বসবে। দেশ বিদেশের শিশু সাহিত্যের প্রকাশকেরা মেলায় যোগদান করবেন। তোমরা সময়মত সুযোগ করে একদিন মেলায় এসো। তোমাদের 'কিশোর-জ্ঞান-বিজ্ঞান'-এর একটি স্টল সেখানে অবশ্যই থাকবে। 14 নভেম্বর পর্যন্ত এই গ্রন্থ মেলা চলবে।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় 1
চিঠিপত্র 2
দপ্তর থেকে
যারা পাহাড়ে বাস করে ॥ সমরজিৎ কর 3
বিজ্ঞান-বিচিত্রা ॥ অনীশ দেব 29
পড়াশোনা
পদার্থবিদ্যার প্রশ্নোত্তর ॥ অলক চক্রবর্তী 20
সহজে যোগ ॥ সিদ্ধার্থ রায় 24
ধাতুর রাজা : সোনা ॥ অমরনাথ রায় 28
জীবন-বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ ॥ তারকমোহন দাস 69
বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প
রোবটে গণ্ডগোল ॥ প্রসাদ সেন 17
প্রত্যাবর্তন ॥ মঞ্জিল সেন 45
ছবিতে গল্প
বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র ॥ দিলীপ দাস 41
খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 42
মজার ছবি ॥ প্রণব হোড় 11
চোর থেকে ডাকু ॥ উজ্জ্বল ধর 49
প্রাণীবিচিত্রা ॥ শৈল চক্রবর্তী 36
জুলভার্নের টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস আণ্ডার দি সী ॥ গৌতম কর্মকার 44
কীট পতঙ্গ উদ্ভিদ
লাক্ষাকীট ॥ অমিয় পাল 12
গোপাদপ ॥ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় 16
পরজীবীর ইতিকথা ॥ বলরাম মজুমদার 50
গাছ যখন গোয়েন্দা ॥ শৈবাল চক্রবর্তী 52
উপন্যাস
সবুজ বনের গান ॥ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ 33
আবিষ্কারের কাহিনী
ব্লটিং পেপার আবিষ্কার ॥ রাজকুমার মুখোপাধ্যায় 13
জ্ঞানবিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
বাংলা শিশুগ্রন্থের সজ্জা ॥ নিখিল সরকার 6
শরৎকালের তারামণ্ডল ॥ বিমান বসু 9
ফালি কাগজের হেঁয়ালি ॥ অরূপরতন ভট্টাচার্য 14
ধূমকেতুর বৃত্তান্ত ॥ সুজয় চক্রবর্তী 25
কয়লার উৎপত্তি ॥ মুক্তিপদ দাস 58
চিকে-গোল্লা খেলা ॥ সুধীর চক্রবর্তী 37
কাচের উপর নক্সা ॥ অজিত চৌধুরী 57
আগামীকালের বিজ্ঞান ॥ অজেয় রায় 53
যন্ত্র যখন সাড়া দেয় ॥ সলিল মিত্র 40
জান্তব জ্বালানি ॥ জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় 39
গ্রহণ-এর রহস্য ॥ বিপ্লবশান্তি ভট্টাচার্য 56
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী
জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য ॥ সুধাংশু পাত্র 31
নোবেল পুরস্কার পেলেন ডঃ সুব্রাহ্মণ্যম ॥ তপনায়ন ঘোষ 72
নিজে কর
মডেল প্রশ্ন-উত্তর সমাধানের যন্ত্র ॥ জ্যোতিষ সরকার 60
ছোটদের দপ্তর
বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার উত্তরদাতাদের নাম 61
নলেজ কুইজ 62 : বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার উত্তর 62
শরীর স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশ্ন ॥ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 76
বিজ্ঞান সংবাদ 76
আমার গ্রামের পরিবেশ সমস্যা ॥ দীপনারায়ণ দত্ত ০4
স্বপ্ন ॥ মানিকচাঁদ মারোঠী 74
মৎস্যকুলের বিচিত্র তত্ত্ব ॥ সুশান্ত ভট্টাচার্য 65
প্রফেসার ডিরোজিরো ও আমি ॥ নির্মল কুমার 66
ভেবে ভেবে বল ॥ শুভব্রত রায়চৌধুরী 63
শব্দকূট ॥ পল্লব মোহান্ত 62 : শব্দকূটের উত্তর 63
শেওলা আমাদের বন্ধু ॥ অজিতকুমার দাস 67
জেনে রাখা ভাল ॥ চিত্তরঞ্জন রায় 68
সুপার কুইজ কনটেস্ট সমাধান 75

সহ-সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ছবি এঁকেছেন অলয় ঘোষাল

চিঠিপত্র

প্রসঙ্গ ঃ ঘনাদা ক্লাব

13. পত্রের শুরুতে জানাই 'ঘনাদা ক্লাবের' জন্য বুক-ভরা কৃতজ্ঞতা। আজ ডাক মারফত যে কবিতাটি পাঠালাম সেটিও ঘনাদা সম্বন্ধীয় এবং স্বয়ং ঘনাদা কর্তৃক স্বপ্নে কথিত। তিনি স্বপ্নে পূর্বোল্লিখিত গানটিকে ক্লাবের 'জাতীয় সঙ্গীত' রূপে ক্লাবের অধিবেশন বসবার পূর্বে গীত হবার নির্দেশ দিয়েছেন।

জয়তু ঘনাদা !

আহা 72 নং বনমালী নস্কর লেনে যেন চাঁদের হাট,
সকাল বিকাল আড্ডাঘরে বসছে ভবের হাট।
শিবু, শিশির, গৌর, সুধীর সবাই যেন গাধা,
আসরের মধ্যমণি 'দ্য গ্রেটেস্ট' ঘনাদা।
'রজদা', 'টেনিদা' পড়েছি যে যত
কিছু ভাল লাগে নাই 'ঘনাদা'-র মত।
'শ্রী ঘনশ্যাস দাস'-তাঁর শুদ্ধ নাম।
তাঁর চরণে মোরা করি শত কোটি প্রণাম।
সিদ্ধার্থদার জয় গান গেয়ে ফেরো সবে।
'ঘনাদা ক্লাব' স্থাপন করে রাখলে কীর্তি ভবে,
ধন্য ধন্য মাসিক পত্রিকা—"কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান"।
'ঘনাদা ক্লাব'-এর জন্য দিল একটি স্থান।
তাই ঘনানন্দে গেয়ে চল প্রশস্তি গান।

ইতি ঘনাদা কর্তৃক স্বপ্নে কথিত পুণ্যবান আশিস মান্না অনুলিখিত 'ঘনাদা প্রশাস্তি সম্পূর্ণ।

আমি ঘনাদা ক্লাবের সাধারণ সদস্য পদ প্রার্থী।

ইতি—

ঘনাদার স্নেহধন্য—আশিস মান্না, মেচেদা, মেদিনীপুর

ঘনাদা ক্লাবের সদস্যপদের জন্য নিয়মাবলী জানতে চেয়ে প্রচুর চিঠি আমাদের দপ্তরে জমা পড়েছে। তাদের নাম ক্রমশঃ প্রকাশ করা হবে।

14. সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিতে ঘনাদার গল্প উপন্যাসের বিস্তৃত পরিচয় পেয়ে খুশী হয়েছি। কিন্তু এই দীর্ঘ পত্রিকায় ঘনাদার নাটক বা ছড়ার কোন উল্লেখ নেই। যতদূর মনে পড়ে ঘনাদা-সম্পর্কিত কয়েকটি ছড়া যা 'ঘনার বচন' নামে দু-একটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঘনাদার নাটক সম্পর্কে অবশ্য কিছু জানা নেই। কেউ হদিস দিতে পারলে খুশী হব। বস্তুতঃ একজন আগ্রহী সদস্য হিসেবেই। আমার এ চিঠি লেখা।

দেববানী ভট্টাচার্য। কলকাতা-56

প্রসঙ্গ ঃ সংখ্যা নিয়ে ভাবনা

গত সেপ্টেম্বর '83 সংখ্যায় 'পড়াশোনা' বিভাগে প্রকাশিত দেবপ্রসন্ন সিংহের 'সংখ্যা নিয়ে ভাবনা' লেখার একটি বিশেষ অংশ প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য রাখছি।

লেখক ঐ বিশেষ অংশে লিখেছেন, "এগারকে ক্রমান্বয়ে গুণ করলে তা পেতে গুণ করার প্রয়োজন নেই। $11 \times 11 = 121$, $11 \times 11 \times 11 = 1232$1, $11 \times 11 \times 11 \times 11 = 1234321$ অর্থাৎ যতবার গুন হচ্ছে, গুন ফলে 1 থেকে পর পর লিখে যেতে হবে সেই সংখ্যাটি পর্যন্ত, তারপর আবার এক করে কমিয়ে এক পর্যন্ত যেতে হবে।" তিনি আরো একটি উদাহরণ দিয়েছেন, $11^9 = 123456$ 78987654321।

$11^2$121, $11^3 = 1331$, $11^4 = 14741$,
$11^5 = 161051$, $11^6 = 1771561$, $11^7$194871 71, $11^8$214358881, $11^9 = 2357947691$, উপরের দুটি ক্ষেত্রে গুণ ফল গুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে লেখক প্রদত্ত গুণ ফলগুলি বিশুদ্ধ (ব্যতিক্রম $11^2 = 121$) নয়।

সুতরাং এ থেকে বলা যায় বিভিন্ন সংখ্যক এগার-এর গুণ ফল লেখকের সূত্র অনুসরণ করে না। কেবল মাত্র 11^2 এর ফলটি সূত্রটিকে মেনে চলে।

অসীমকুমার জানা, বনমালী চট্টা হাইস্কুল

সেপ্টেম্বর 83 সংখ্যায় প্রকাশিত 'সংখ্যা নিয়ে ভাবনা' নিবন্ধে কয়েকটি ত্রুটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বিশেষত শেষ পরিচ্ছেদের প্রথমে যে কটি লাইন আছে। শেষ পরিচ্ছেদটি শুরু এবং সংশোধিত হবে এই ভাবে ঃ

গুণ মনে রাখার অনেক উপায় আছে। যেমন পর পর একের গুণ বর্গ হিসাবে দেওয়া থাকলে তা পেতে গুণ করার প্রয়োজন নেই।

$11 \div 11 = 121$; $111 \times 111 = 12321$; $1111 \times 1111 = 1234321$; অর্থাৎ যতবার 1 লেখা হচ্ছে গুণ ফলে 1 থেকে পর পর লিখে যেতে হবে সেই সংখ্যাটি পর্যন্ত, তারপর আবার এক করে কমিয়ে এক পর্যন্ত যেতে হবে। সেই রকম 9টা একের সঙ্গে 9টা এক গুণ করলে হবে 12345678987654321

দেবপ্রসন্ন সিংহ, 73বি একডালিয়া রোড, কলি-19

যারা পাহাড়ে বাস করে

সমরজিৎ কর

তোমরা যারা সমভূমিতে বাস কর, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারবে না। কিন্তু তাদের কথা একবার ভাব দেখি। যাদের বাস সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কম করেও প্রায় 6000 ফুট বা তারও বেশি উপরে কোন পাহাড়ে রাজ্যে? তাদের জীবনে সব চেয়ে বড় সমস্যা অকসিজেন। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যত উপরে উঠবে প্রতি ঘন সেনটিমিটারে অকসিজেনের পরিমাণ তত কমবে। সেই সঙ্গে কমবে বাতাসের চাপ। তেমন পরিবেশে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী তাদের শরীর কি ভাবে খাপ খাইয়ে নেয়, বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো পর্যন্ত সত্যিই সেটা যেন বড় রকমের একটি রহস্য।

একটা হিসেব দিই। দক্ষিণ আমেরিকার অ্যান্দেজ এবং এশিয়ায় হিমালয় পর্বতমালার 6000 ফুট বা তারও বেশি উঁচু অঞ্চলে এখন বাস করছে প্রায় তিন কোটির মতো মানুষ। এদের মধ্যে এক কোটির মত মানুষ বাস করে 12000 ফুট উঁচুতে। আর এ ব্যাপারে সারা পৃথিবীতে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে পেরুর একদল আদিবাসী। অ্যান্দেজ পর্বতমালার যে জায়গায় তারা স্থায়ীভাবে বাস করে সেখানকার উচ্চতা 17500 ফুট। তাদের বলা হয় কুয়েচুয়া ইনডিয়ানস। কতকাল ধরে তারা সেখানে বাস করছে, বলা শক্ত। প্রধানত আলু এবং ভুট্টা, এই তাদের চাষবাস। যারা সোমত্ত তারা কাজ করে খনিতে। সেই খনিও রয়েছে প্রায় 19000 ফুট উচ্চতায়। কাজ করতে গিয়ে প্রতি দিন পাহাড়ের পথ ধরে তাদের ওঠা নামা করতে হয় 1500 ফুট। তাদের বিশ্রামের জন্যে 18000 ফুট উচ্চতার বসান হয়েছে ক্যাম্প্। খনির মালিকরা বলেন, রোজ রোজ নামা ওঠা না করে কাজের দিনগুলিতে এখানে থেকে যাও না বাপু। কিন্তু বললেই তো হয় না? সেখানে বেশি দিন বাস করলে শরীর যে নেয় না? শ্রমিকদের অভিযোগ, ওই ক্যাম্পে কয়েক দিন এক নাগাড়ে বাস করার পর তাদের শরীরের ওজন যায় কমে। কোন কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। খিদে কমে। কমে ঘুম। এ সব দেখে শুনে বিজ্ঞানীরা বলছেন, 17500 ফুট উচ্চতার উপরের কোন জায়গা মানুষের বসবাস করার পক্ষে নিরাপদ নয়।

কারণটা কি?

এই কারণটি জানার ব্যাপারেই দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করে আসছেন বিজ্ঞানীরা। অ্যান্দেজ, আফ্রিকার কিলিমানজারো এবং হিমালয়ের যে সব অঞ্চলে মানুষ উঁচু জায়গায় বাস করে সে সব অঞ্চলে বসিয়েছেন তাঁরা প্রচুর গবেষণাগার। ওই সব গবেষণাগারে মানুষ এবং ইঁদুর, খরগোস প্রভৃতি প্রাণীর উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন।

কিছু দিন আগে এ সব নিয়ে কাজ করছেন এমন একজন বিজ্ঞানীকে প্রশ্ন করেছিলাম, বলুন তো, সমস্যাটা কি?

ভদ্রলোক বললেন, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যত উঁচুতে উঠবেন, বাতাসে অকসিজেনের মাত্রা কমতে থাকে। সেই সঙ্গে কমতে থাকে তাপমাত্রা। অকসিজেন কমতে থাকায় যে সব মানুষ সমভূমি থেকে সেখানে যায়, তাদের শরীরে দেখা দেয় এক ধরনের উপসর্গ। বিজ্ঞানীদের ভাষায় যাকে বলা হয় 'হাইপক্সিয়া'। শরীরে অকসিজেনের ঘাটতি হলেই এটা দেখা দেয়। তখন ঘন ঘন শ্বাস নিতে হয়। শরীরে হাঁফ ধরে। সেই সঙ্গে ক্লান্তি। চিন্তাভাবনা কেমন জট পাকাতে শুরু করে। মনে হয় বুকের উপর চেপে বসেছে একটি পাথর। দৃষ্টি হয় ক্ষীণ। এ ছাড়া অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় হাত পা যেন জড় হতে শুরু করে।

ভদ্রলোক বললেন, যাঁরা পর্বত আরোহণে যান, উঁচু পাহাড়ে কিছুটা উচ্চতায় ওঠার পর কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিন ধরে মাঝে মাঝে তাদের বিশ্রাম করতে হয়। সে সময় প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয় তাদের শারীর বৃত্ত। তাদের ওই পরিবেশে কিছুটা অভ্যস্থ হয়ে পড়লে, আবার শুরু হয় তাদের উপর চলা। এই ভাবে থেমে থেমে পর্বত আরোহীরা পথ চলেন।

একটা কথা এখানে বলে রাখি। ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উঁচুতে উঠবে সেই সঙ্গে বাতাসে অকসিজেনের অনুপাত যে কমে আসে, তা অবশ্য নয়। ভূপৃষ্ঠে বাতাসে অকসিজেনের অনুপাত প্রায় 21 শতাংশ। সেখানেও তাই। বাতাসে চাপ কমে যায় বলে, প্রতি ঘন সেণ্টিমিটার বাতাসে অকসিজেনের পরিমাণটাই কমে। অর্থাৎ সমতলে যতটা বাতাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে চালান করলে যে পরিমাণ অকসিজেন তোমরা ফুসফুসে চালান করতে পার, পাহাড়ের শীর্ষে অতটা অকসিজেন সে পরিমাণ (আয়তন অনুযায়ী) বাতাসে পাবে না। এর জন্যেই যত গোলমাল।

তোমরা জান, সমুদ্রতলে বাতাসের চাপ 760 মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের চাপের সমান। 12500 ফুট উঁচু কোন জায়গায় এই চাপ নেমে গিয়ে দাঁড়ায় 480 মিলিমিটারে। চাপ কমলে আয়তন বাড়ে। এর ফলে সমুদ্র তলের এক ঘন সেণ্টিমিটার আয়তন সেখানে গিয়ে দাঁড়ায় দুই ঘন সেণ্টিমিটারের মত। তবে আয়তন বাড়ল কিন্তু ওই দুই ঘন সেণ্টিমিটারে অকসিজেন, নাইট্রোজেন, প্রভৃতি গ্যাসের অণুর সংখ্যা তো একই থেকে গেল। অতএব ওই চাপে এক ঘন সেণ্টিমিটার যে বাতাস গ্রহণ করবে তাবে অকসিজেন অণুর সংখ্যা যে কমবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

পাহাড়ের উঁচু অঞ্চলে যারা বাস করে অকসিজেনের ঘাটতি এবং অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ছাড়াও তাদের বাস করতে হয় আরো রকম প্রতিকূল পরিবেশে। পাহাড়ের গা বেয়ে যত উঁচুতে উঠবে, বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা বা ধোঁয়ার পরিমাণ কমবে। ফলে সে সব অঞ্চলে সূর্যের কিরণ অনেক বেশি উজ্জ্বল। সেখানে বর্ষিত হয় অতিরিক্ত অতিবেগুণী রশ্মি। তেজস্ক্রিয় এই রশ্মির সংস্পর্শে এসে সেখানকার বাতাস আরো বেশি পরিমাণে আয়নিত হয়। এ ছাড়া সূর্য থেকে ভেসে আসে নানা রকম আয়নিত কণা যাদের বলা হয় মহাজাগতিক রশ্মি। পাহাড়ের গা বেয়ে যত উপরে উঠবে এই সব ক্ষতিকর রশ্মির মাত্রাও যাবে বেড়ে। এই সব রশ্মিও শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

তবে একটা কথা আছে না—ওই যে 'অভিযোজন'? প্রাণী এবং উদ্ভিদ সব সকলেই তো চায় পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে বাঁচতে? তাই শীতের দেশের প্রাণীর শারীর বৃত্ত হয় এক রকম, গরম দেশের প্রাণী এবং উদ্ভিদের শারীরবৃত্ত হয় কিছুটা আলাদা। কোন কোন প্রাণী মানুষ, উত্তর মেরু অঞ্চলে কেমন দিব্যি বাস করছে। তাদের আমাদের মত গরম দেশে নিয়ে এস—দেখবে তারা অস্বস্তিতে ভুগছে। গরমে অনেকে বাঁচতেও পারে না। দীর্ঘকাল কোন পরিবেশে বাস করতে করতে প্রাণী এবং উদ্ভিদের শরীরে পরিবর্তনও আসে।

যেমন ধরো, কুয়েচুয়া ইনডিয়ান এবং হিমালয় অঞ্চলের শেপারা। উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে বলে, তাদের বুকের পরিধি আমাদের তুলনায় গড়ে অনেকটা বড় হয়। সেই সঙ্গে ফুসফুসেরও আয়তন। ফলে প্রতিবার প্রশ্বাসের সময় তারা বেশি পরিমাণ অকসিজেন গ্রহণ করতে পারে; ওরা যেখানে বাস করে সেখানে গেলে আমরা তা পারব না। এ ছাড়া তাদের রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা আমাদের চেয়ে বেশি। তাদের হৃদ্‌পিণ্ড আমাদের চেয়ে বড়। শরীরে রক্তের গতি আমাদের চেয়ে মন্থর।

একটা মজার পরীক্ষা করেছেন তিমিরাস নামে এক বিজ্ঞানী। তিনি সমুদ্র সমতল অঞ্চলের এক দল ইঁদুর নিয়ে যান 12500 ফুট উঁচু এক পার্বত্য অঞ্চলের গবেষণাগারে। কিছু দিন পর দেখা গেল, তাদের রক্তে লাল কোষ এবং হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বেড়েছে শতকরা 54.6 ভাগের মত। এদের যখন বাচ্চা হল, সেই বাচ্চাদের দুই দলে ভাগ করলেন তিনি। এর পর একটি দলকে নিয়ে এলেন তিনি সমুদ্রতল সমন্বিত সমভূমিতে। বাকিদের সেই পাহাড়ে রাজত্বেই রেখে দিলেন। কিছুদিন পর দু দলের যখন বাচ্চা হল, তখন দেখা গেল, যারা সমভূমিতে জন্মেছে তাদের রক্তে লোহিত কণার সংখ্যা অন্যান্য সমভূমিবাসী ইঁদুরেরই মত। কিন্তু পাহাড়ের ওই উচ্চতায় জন্মেছে তাদের রক্তে হিমোগ্লোবিন বেড়েছে 66.7 শতাংশ। বোঝা যাচ্ছে, সেই বাচ্চা গুলো তাদের বাবা মাদের চেয়েও ওই পরিবেশে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার ক্ষমতা আরো বেশি অর্জন করেছে।

হয়ত জিজ্ঞেস করার, এ সব তথ্য জেনে কি লাভ?

এর একটিই উত্তর: সমতল ভূমির মানুষদেরও এমন উঁচু পাহাড়ে যেতে হচ্ছে দলে দলে। তারা যাচ্ছে সেখানকার খনিজ সম্পদ এবং বন সম্পদের সন্ধানে। দেশের সীমানা পাহারা দেশের জন্যেও এখন হাজার হাজার সৈনিক বাস করছে উঁচু পার্বত্য এলাকায়। তারা যাতে ওই সব অঞ্চলে গিয়ে স্বাভাবিক শরীরে গিয়ে কাজ করতে পারে—তার জন্যেও প্রয়োজন এ সব তথ্য জানার। এর জন্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও গবেষণা চলছে। এই সব গবেষণা থেকে ভবিষ্যতে আমরা আরো অনেক তথ্য জানতে পারব। যার, উঁচু পার্বত্য এলাকায় গিয়ে বাস করবে সেই সব তথ্য সেখামে তাদের সুস্থ দেহে বাস করার ব্যাপারে সাহায্য করবে।

অষ্টম নিখিল বঙ্গ বিজ্ঞান ও শিল্প শিবির ১৯৮৪

২২-২৬শে জানুয়ারী, ১৯৮৪ আলিপুর চিড়িয়াখানার পাশে

উক্ত শিবিরটিতে যোগদান করবার জন্য স্কুল, কলেজ, বিজ্ঞান ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে সাদা কাগজে কিম্বা সংস্থার প্যাডের কাগজে দরখাস্ত করতে আহ্বান জানান যাইতেছে।

(ক) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রদর্শনী ঃ

বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে মডেল, চার্ট, বা প্রজেক্ট সহ যোগদান করবার সুযোগ আছে। সংক্ষিপ্ত বিবরণ সমেত লিখতে হবে। কোন প্রবেশ মূল্য নেই। প্রতিযোগিকে এক পিঠের গাড়ী ভাড়া ও চারদিন থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। নগদ টাকা ও সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। [গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার]

(খ) বিজ্ঞান ক্যুইজ / রচনা প্রতিযোগিতা ঃ

১৮ বছর বয়স পর্যন্ত তরুণ-তরুণীরা যোগদান করতে পারেন। (সময় ও তারিখ পরে জানান হবে)। নগদ টাকা ও সার্টিফিকেট পুরস্কার দেওয়া হবে।

(গ) বিজ্ঞান ও পরিবেশ চেতনা উদ্যোগ কোর্স (এক দিনের) ঃ

মোট ২০০টি আসন। স্কুল কলেজের শিক্ষক, ছাত্র, যুব ও যে কোন আগ্রহী ব্যক্তি যোগদান করতে পারেন। কোর্সের বইপত্র, খাতা, পেন ও আহারাদি সমেত প্রবেশ মূল্য ২৫ টাকা। অগ্রিম মনি অর্ডারে ৩০শে ডিসেম্বর এর মধ্যে নীচের ঠিকানায় টাকা পাঠাতে হবে। মনি অর্ডার কুপনের পেছনে নাম ও ঠিকানা অবশ্যই থাকা দরকার।

(ঘ) বিজ্ঞান গ্রন্থ ও বিজ্ঞান পত্রিকা পুরস্কার ঃ

প্রকাশক, সম্পাদক ও গ্রন্থকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জনপ্রিয় বই পুরস্কারের জন্য ২ কপি করে নীচের ঠিকানায় পাঠান। ৩০শে ডিসেম্বর '৮৪র মধ্যে। নগদ টাকা ও সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। [রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার]

বিশেষ আকর্ষণ ঃ জনপ্রিয় বক্তৃতা, চলচ্চিত্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

আবেদন করুন ঃ—

সম্পাদক, দ্য সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল, ১০৪, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলকাতা-৮

বাংলা শিশুগ্রন্থের সজ্জা

নিখিল সরকার

শিশু সাহিত্যের অঙ্গসজ্জার ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। কারণ সপ্তদশ শতকের আগে আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর কোন দেশেই কোন চিত্রিত শিশু-পুস্তক ছিল না। এর আগে গ্রন্থসজ্জা বা পুস্তকে চিত্র অলঙ্করণ বলতে বড়দের বইকেই বোঝাত। গ্রন্থসজ্জার আরম্ভ সেখানেই। এমন কি, এই সেদিন পর্যন্তও এজাতীয় অলঙ্করণ সীমাবদ্ধ ছিল শুধু মাত্র বড়দের গল্প, উপন্যাস এবং কাব্য পুস্তকাদিতেই। কিন্তু আজকের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। চিত্রালঙ্করণের স্থান এখন ছোটদের বইয়েই সর্বাগ্রে। আজকাল বড়দের বইএ তার স্থান খুবই সীমাবদ্ধ। এবং বলতে গেলে ক্রমে সঙ্কুচিত হতে হতে এখন কোনমতে মলাটখানাকে আশ্রয় করে টিকে আছে মাত্র। অথচ অন্যদিকে ছোটদের বই—ছবির রাজ্য, ছবি ছাড়া আজকে তা কল্পনাও করা যায় না।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, অর্থাৎ এদেশে ছাপাখানা চালু হওয়ার স্বল্পকাল পরেই বাংলা শিশুপুস্তক রচনায় যে উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় বাঙ্গালী বিদ্বৎসমাজে তখন থেকেই বাংলা শিশু সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই যুগের প্রথম অভিযাত্রী। তাঁর রচিত বহুপ্রচারিত বর্ণ পরিচয়ের প্রথম প্রকাশ 1912 সংবৎ, ইংরেজী 1855। বলা বাহুল্য, সেদিনের প্রধানতম যোগ্য শিশুপাঠ্য পুস্তকের ত্বরান্বিত ব্যবস্থা। তাই এই সমস্যাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয় বা তদানীন্তন অন্যান্য গ্রন্থকর্তার প্রয়াস কেন্দ্রীভূত হওয়া আশ্চর্যজনক ছিল না। বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। সেকালের সমাজ পরিবেশ এবং জাতীয় সঙ্কটের কথা স্মরণে রাখলে বর্ণ-পরিচয়ের নীতিকথাকে আজও অপ্রয়োজনীয় বা অর্থহীন বলে মনে হয় না। বর্ণপরিচয়ের চিত্রের দিক গৌণ। তাছাড়া, আজ হয়ত আর তাকে উপাদেয় বলে মনে হয় না—কিন্তু বাংলা শিশু সাহিত্যের প্রারম্ভ-পর্বেই পুস্তকে চিত্র সংযোজন করে যে বিজ্ঞতা এবং শিশু মনস্তত্ত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন গ্রন্থকর্তা এবং প্রকাশক তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বর্ণপরিচয়ের (পরবর্তী সংস্করণ) ভূমিকায় বলা হয়েছে "—বালক বালিকাদের পাঠে প্রীতি, মনসংযোগ এবং আমোদ উৎপাদনের আশায় প্রত্যেক বর্ণের নীচে একখানি ছবি দিয়াছেন। তদ্দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ হইলে তাঁহার শ্রম সার্থক জ্ঞান হইবে।" উড্ ব্লকের এই ছোট ছোট ছবিগুলোর বিশেষত্ব হয়ত তেমন কিছু নেই; তবুও উদ্যোক্তাদের শ্রম যে সার্থক হয়েছে 'বর্ণ পরিচয়ের' অব্যাহত জনপ্রিয়তাই তার সাক্ষী।

একালের উল্লেখযোগ্য সচিত্র শিশু-পুস্তকের মধ্যে রাম-সুন্দর বসাকের বাল্যশিক্ষা (প্রথম সংস্করণ 1889 খৃঃ), যোগীন্দ্রনাথ সরকারের হাসিখুসী প্রভৃতি গ্রন্থ আজও বাংলার ঘরে ঘরে সমাদৃত। এগুলো সবই শিশুদের প্রথম পাঠ, বর্ণমালার বই। সুতরাং বিষয়বস্তুর দিক থেকে গতানুগতিক, কিন্তু চিত্রের দিক থেকে বাংলা শিশুপুস্তকের এই বইগুলো আলোচনার দাবী রাখে। বাল্যশিক্ষার একমাত্র প্রচ্ছদপট-খানা ছাড়া, অন্যান্য ছবি সাধারণ, তাছাড়া সংখ্যায়ও খুব বেশী নয়। কিন্তু ছবির দিক থেকে যোগীনবাবুর হাসি খুসী এবং অন্যান্য শিশুসাহিত্যগুলো উৎকৃষ্ট গ্রন্থসজ্জার উদাহরণ হিসাবে স্মরণীয়। হাসিখুসীর এটা ৬৩তম সংস্করণ চলছে এবং এর ছবিগুলোরও পরিবর্তন করা হয়েছে। এর আদি ছবিগুলো এখন আর নেই। সে যুগে ব্লক তৈরীর উন্নত ব্যবস্থা ছিল না তবুও যোগীন্দ্রনাথ বহু শ্রম স্বীকার করে এবং বহু অর্থব্যয় করে বিদেশীদের অনুকরণে তাঁর বইগুলোকে ছবিতে ভরে দিয়েছিলেন। এজন্যে তাঁকে ব্লক তৈরী করিয়ে আনতে হয়েছিল বিদেশ থেকে। হাসিখুসীর ছবির বিষয়বস্তু ছিল নানা জন্তু-জানোয়ার এবং মানুষের (বিশেষ করে শিশুদের) ছবি। কিন্তু তাদের কোনটিই দেশীয় নয়। অর্থাৎ যে কুকুর বাংলার ছেলেমেয়েরা দেখে থাকে কিংবা যে পোশাক তারা পরে থাকে ছবির কুকুর বা ছেলেমেয়েরা, তাদের পোশাক পরিচ্ছদ সবই ভিন্ন। বোধ হয়—শিল্পীও ছিলেন বিদেশী। যোগীনবাবুর অন্য পুস্তকে বিশেষ করে হাসি-রাশির চিত্রগুলো এদিক থেকে অতুলনীয় এবং সম্পূর্ণ পৃথক্ ভঙ্গীতে আঁকা। এই ছোট্ট বইখানিতে ছবি আর কথা চলেছে হাত ধরাধরি করে। কোনটিকে বাদ দিয়ে কোনটিকে নিয়ে মত্ত হবার উপায় নেই। ছবিগুলোই যেন এ বইয়ে আঁকা হয়েছে প্রথমে—আর ছড়া তাকে অনুসরণ করেছে মাত্র। মুখ্যত ছবি-নির্ভর এজাতীয় বই-এ যোগীনবাবুই বোধ হয় প্রথম।

রেখা এবং লেখার এজাতীয় সার্থক সমন্বয়ের প্রসঙ্গে

মনে পড়ে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের 'ক্ষীরের পুতুল' (১৮৯১); দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের ঠাকুরমার ঝুলি (বাংলা ১৩১৪, ইংরেজী ১৯০৩); সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল এবং রবীন্দ্রনাথের 'সে' বইখানির কথা। আমাদের শিশু সাহিত্যের মত গ্রন্থসজ্জার ইতিহাসেও এদের প্রত্যেকটির স্থান—অতি উচ্চে। 'ক্ষীরের পুতুল' অবনীন্দ্রনাথের শিক্ষার্থী জীবনের সৃষ্টি। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন ইংরাজী চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির ছাত্র এবং স্বভাবতঃই তাঁর তদানীন্তন চিত্রাদি বিলাতী প্লভাবে প্রভাবান্বিত এবং বিদেশী আঙ্গিকে আঁকা। ক্ষীরের পুতুল এবং কবিগুরুর চিত্রাঙ্গদা অঙ্গসজ্জাই তাঁর প্রথম মৌলিক কাজ।

বাংলা শিশু সাহিত্যে দক্ষিণারঞ্জন নাম চিরস্মরণীয়। দক্ষিণারঞ্জনের ভাষা, গল্প বলার কৌশল, প্রাণোচ্ছলতা এবং সলজ্জ রোমাঞ্চকতা বাংলা শিশু সাহিত্যের সম্পদ। শিশু সাহিত্যের সম্রাট দক্ষিণারঞ্জনকে যাঁরা কথাশিল্পী বলেই জানেন তাঁরা শুনলে বিস্মিত হবেন ঠাকুরমার ঝুলির যে ছবিগুলো মুহূর্তে শিশুমনকে টেনে নিয়ে যায় রাজকন্যার কালো চুলের মত মেঘের রাজ্যে সাগর তলে পাতাল-পুরীর অন্ধ কক্ষে, যেখানে ঝাড় লণ্ঠনের আলোর নীচে ঘুমন্ত রাজকন্যার—নিঃশ্বাসের সঙ্গে যার বেরিয়ে আসে লক্ষ অজগর সেই ছবিগুলো দক্ষিণারঞ্জনের নিজের হাতে আঁকা। ঠাকুরমার ঝুলির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন—"অবশেষে বসিয়া ছবিগুলি আঁকিয়াছি। যাদের কাছে দিতেছি তাহারা দেখিয়া হাসিলে জানিলাম আঁকা ঠিক হইয়াছে।" আশ্চর্য এই তাঁর ছবিগুলো সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দেবার অধিকার তিনি ছেড়ে দিয়েছেন শিশু বিচারকদের হাতে। যাদের জন্য এত শ্রম এত সজ্জার আয়োজন সেই কচি কাঁচারাই যে আসল বিচারক একথা এই সেদিন পর্যন্ত অধিকাংশ শিশুগ্রন্থের চিত্রকরদের জানা ছিল না। নিজেদের রুচি অনুযায়ী শিশুদের খুশি করার ব্যর্থ চেষ্টায় শিশুদের উপর জুলুম চালানো হয়েছে ইংরেজী শিশু সাহিত্যের মধ্যযুগে। আনন্দের বিষয় এই, বাংলা শিশু সাহিত্যে এজাতীয় নজীর কম। যে পরম বিজ্ঞতার সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন বাংলার শিশুদের কাছে নূতন জগতের বার্তা এনেছিলেন —সেই বিজ্ঞতা সেই মমত্ববোধের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখেছেন —তাঁর চিত্রপরিকল্পনায়। এত রোমাঞ্চ এত অসম্ভাব্য ঘটনার ভিড়, চারদিকে রাক্ষসের হাউ মাউ-এর মধ্যেও বাংলার শিশুরা যে 'নেপুর রূপ' (ঠাকুরমার ঝুলি) দেখে হেসেছে এবং আজও হাসছে এ সত্যিই আমাদের শিশু গ্রন্থসজ্জার গৌরব।

'আবোল তাবোলে'র কবির দায়িত্ব বোধও অনুরূপ সদা সতর্ক সচেতন। সুকুমার রায় দায়িত্ব নিয়েছিলেন —বাংলা দেশের হুঁকোমুখো হ্যাংলা—যাদের সর্ব অবস্থাতেই হাসতে মানা, তাদের তিনি হাসাবেন। কবিতায় তিনি তাতে সমর্থ হয়েছেন—এমনকি, ছবিতেও। আবোল তাবোল-এ ছবির সঙ্গে কথার যোগ কবির কথাতেই স্পষ্ট। ট্যাস গরুর বর্ণনাক্রান্ত কবি অবশেয়ে বলছেন—'বর্ণিতে রূপ গুণ সাধ্য কি কবিতার, চেহারার কি বাহার ঐ দেখ ছবি তার।' সত্যিই এই রূপ এমন জ্যান্তভাবে বর্ণনা করা কবিতার সাধ্য নয়। শুধু এই একখানা ছবি নয়—খাপছাড়া অসম্ভবের আবোল তাবোলে যে রূপ রাজ্যের সৃষ্টি কবি এই বইখানাতে করেছেন—তার অর্ধেক রূপই তার ছবিগুলোতে। ছবিগুলো যথার্থই এই বইয়ের অলঙ্কার। বার বার মনে হয়, ছবির উদ্দেশ্য বোধ হয় এমনভাবে সার্থক হতো না, যদি সুকুমার রায়ের মত শিল্পী নিজেই তুলি হাতে না নিতেন। কবি নিজেই যদি তাঁর মানসমূর্তিদের এমনভাবে রেখাবদ্ধ না করতেন—তাহলে কি হতো জানি না, তবে 'খুড়োর কলের' শুধু পরিকল্পনা (Plan) অনুযায়ী কল নির্মাণ বা 'ভয় পেয়ো না' কবিতার চরিত্রটির মত চরিত্র চিত্রণ বোধ হয় অন্যভাবে হতো না। সুকুমার রায়ের এই বহুরেখ চিত্রগুলোর আর একটি গুণ ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরস। কোন কোন ছবি পাঞ্চের (Punch) বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রীদের স্মরণে আনে। তবে পার্থক্য এই, আবোল তাবোলের এই হাস্যরস আড়াই বছরের শিশুর চোখও এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

উল্লেখিত পুস্তকগুলো ছাড়া আধুনিকতম কালে বিভিন্ন হাতে আমাদের শিশু-সাহিত্যের রূপসজ্জা আরও সমৃদ্ধতর হচ্ছে! অন্তত আঙ্গিকের দিক থেকে বর্তমানে আমরা অনেকখানি এগিয়েছি, তাদের সকলের কথা আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। তবে দু-একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যাবে।

সমসাময়িক কালে শিশু গ্রন্থের বিশেষ চিত্রনের কথা বলতে প্রথমেই আসে শিল্পাচার্য নন্দলালের আঁকা রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ (1337) প্রথম ও দ্বিতীয়বারের ছবিগুলোর কথা। বলতে গেলে আমাদের শিশু সাহিত্যে নানা দিক থেকে এগুলো উজ্জ্বলতম অলঙ্করণ। আঙ্গিকের দিক থেকে এগুলো অবশ্য নূতন নয়—কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী এবং চিত্র হিসাবে এগুলো পূর্বেকার সমস্ত চিত্র থেকে ভিন্ন, প্রথম ভাগের ছবিগুলো উড্‌কাটে সাদায় কালোয় অঙ্কিত,

অনাড়ম্বর, সহজ, স্পষ্ট এবং স্থির চিত্র, কখনও কখনও একটু নক্সাধর্মী! প্রাত্যহিক অতি পরিচিত বস্তু এবং মানুষের এ এক অপরূপ মিছিল। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের যে অনাড়ম্বর, সহজ সুর ধ্বনিত হয়েছে বইখানিতে—ছবিগুলো অতি অপূর্বভাবে সঙ্গতি স্থাপন করেছে তার সঙ্গে। তাছাড়া বই-এর বিষয়বস্তুর নিছক চিত্রগত বিবৃতি এগুলো নয়. শিশু পড়ছে এক কথা, আর চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছে ভিন্ন চিত্র। বাহ্যত ভিন্ন, কিন্তু ভাবে উভয়েই এক, শুধু মাত্র কল্পনার একটুখানি আকাশ, লেখা আছে "চ ছ জ ঝ দলে দলে, বোঝা নিয়ে হাটে চলে।" উপরে তাকিয়ে ছবি দেখা গেল—সারি সারি ছোট ছোট বড় বড় তালগাছ দূর মাঠের পারে দাঁড়িয়ে—চলমান মানুষের সঙ্গে এই স্থবির গাছের পার্থক্য দৃশ্যতও কিছু আছে বটে—কিন্তু শিশুর কল্পনার কাছে এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা। নন্দলালের চিত্রের ভাববস্তুকে অবলম্বন করে—যে কেমন করে নবরূপালোক সৃষ্টিতে সক্ষম—ছড়ার ছবি' রচনায় কবিগুরু তা দেখিয়েছেন। বাস্তবিক পাঠ্যবস্তুকে সহজভাবে উপলব্ধি করবার এবং সেই সঙ্গে শিশু কল্পনার প্রসারের পক্ষে নন্দলাল যে চিত্রগুলো উপস্থিত করেছেন. তা যে কোন দেশের শিশু-শিক্ষায় নব আদর্শ বলে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় ভাগের ছবিগুলো আবার একটু ভিন্ন রকমের। এগুলো রেখাশ্রয়ী এবং প্রথম ভাগের স্থির ভাগ এখানে ভঙ্গীযুক্ত, কখনও কখনও ঘটনার সালঙ্কার বিবৃতিও এখানে রয়েছে। তবে অপেক্ষাকৃত স্বল্প রেখায় অঙ্কিত বলে—তাতে শিশুর পক্ষে রসগ্রহণে অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই। ছবিগুলোর এই পরিকল্পনা ছোটদের রং লাগানোর সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে বলে জানান হয়েছে ভূমিকায়। এদিক থেকেও বইখানার ছবি অভিনব। মহৎ শিল্পীর রেখার বেষ্টনী রং-এ ভরতে ভরতে আনন্দের সঙ্গে ভাবের যদি সামান্য স্পর্শও পায় কোন শিশু, তাহলে এই রং-এর খেলা সার্থক হবে তার জীবনে—এইটুকু বলেই নন্দলালের কথা শেষ করছি। কবিগুরুর লেখার সঙ্গে শিল্পাচার্যের এই রেখার সঙ্গত যে ঐকতানের সৃষ্টি করেছে, এই বইগুলোতে লিখে বোঝানো তা অসম্ভব। তবে এইটুকু বলতে পারি, সাম্প্রতিক কালে বাংলা ভাষায় এমন সার্থক শিশু-পুস্তক আর রচিত হয়নি।

বাংলা শিশু-পুস্তকের আর একটি দিক রঙ্গীন চিত্র। রঙ্গীন চিত্রের ব্যাপারে আমরা এখনও অন্য দেশের তুলনায় অতি পশ্চাদবর্তী। তবে গত কয়েক বছরে লিথো, হাফটোন, অফসেট প্রভৃতি আধুনিক প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু দ্বিবর্ণ, ত্রিবর্ণ, এমনকি, বহুবর্ণ পুস্তকও রচিত হয়েছে বাংলা ভাষায়। এমনকি, শুধু রঙ্গীন শিশু পুস্তকের প্রকাশার্থে সম্প্রতি কয়েকটি প্রকাশনালয়ও আবির্ভূত হয়েছে আমাদের দেশে। হাট্টিমা টিম, আগডুম বাগডুম প্রভৃতি ছড়ার বইএ শিল্পী গোপাল ঘোষের অঙ্কিত রঙ্গীন চিত্রগুলো আমাদের শিশু-সাহিত্যে রঙ্গীন চিত্র রচনায় নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্কিত চিত্রাদি অনুরূপ প্রশংসা পাবার যোগ্য। তবে বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে, বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ততায় এবং চিত্রের বলিষ্ঠতায় গোপাল ঘোষের প্রচেষ্টা বোধ হয় শিশু মনের অধিকতর নিকটবর্তী। যাহোক উভয়ে স্ব স্ব যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। অন্যান্য আধুনিক শিশু গ্রন্থের আলঙ্কারিক হিসাবে অনেক শিল্পীই যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

পরিশেষে একটা কথা বলেই এই আলোচনার উপসংহার করছি। দেশে শিল্প শিক্ষার উন্নতি, আঙ্গিকগত নব নব পরীক্ষা ও পরিবেশন ব্যাপারে বিবিধ উদ্ভাবনের ফলে বাংলা শিশু-সাহিত্যের অঙ্গসজ্জা আজ যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তার চেয়ে উন্নততর দিনের সম্ভাবনার লক্ষণ অতি স্পষ্ট। বিখ্যাত সাহিত্যিকদের অকৃপণ দানে এবং শিল্পীদের মমতাময় সহযোগিতায় যে ঐতিহ্য ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে—তার এখানেই শেষ মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। তবুও এ বিষয়ে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ এতক্ষণ বাংলা শিশু-সাহিত্যের আলোর দিকটাই শুধু আলোচিত হয়েছে, এর উল্টো দিকও আছে। সাধারণ গল্পপুস্তক কিংবা প্রাথমিক, মাধ্যমিক বইয়ের পাতা উল্টালেই দেখা যাবে—তার নজীর কম নয়। সাধারণ কমার্শিয়াল চিত্রকরের হাতে পড়ে সস্তায় আমোদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে জঘন্য চিত্রও শিশু-পুস্তকের অলঙ্করণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, পাঠ্য-পুস্তকেও এ-জাতীয় শিল্পীদের হাতে পড়ে আকবর বা বুদ্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রে পরিণত হয়েছেন, এমন দৃষ্টান্তও আছে।

সাময়িক আনন্দ দান করা ছাড়াও শিশুর বই-এর চিত্র যেখানে তার শিক্ষা তথা জীবন গঠনের সঙ্গে যুক্ত সেখানে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলেরই আরও যত্নবান হওয়া উচিত।

[1361-দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশের পুনর্মুদ্রণ]

শরৎকালের তারামণ্ডল

বিমান বসু

এর আগে তোমাদের উত্তর আকাশের কয়েকটি তারামণ্ডলের বিষয় বলেছি। এবারে আকাশের বাকি তারামণ্ডলগুলি কেমন করে চিনবে সে কথা বলবো। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, বিভিন্ন মাসে রাতের আকাশে বিভিন্ন তারামণ্ডলকে দেখতে পাওয়া যায়। আমরা তারামণ্ডলগুলিকে 6 ভাগে ভাগ করে সেগুলিকে আলাদা আলাদা চিনে নিতে চেষ্টা করবো। এভাবে তাদের চিনে নিতে অনেক সুবিধে হবে।

প্রথমেই এসো দেখা যাক্ শরৎকালে (ভাদ্র-আশ্বিন মাসে) রাতের আকাশে কোন্ কোন্ তারামণ্ডলকে দেখতে পাওয়া যায়। শরতের আকাশে তারা চেনার একটা মস্ত সুবিধে হলো এই যে, বর্ষার পর বায়ুমণ্ডলের যত ধুলো-ধোঁয়া সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়। ফলে আকাশ একেবারে কাঁচের মতো স্বচ্ছ দেখায় আর তাতে তারাগুলিকেও আরো জ্বলজ্বলে দেখায়।

শরতের আকাশে প্রথমেই তোমাদের চোখে পড়বে তিনটি খুবই উজ্জ্বল তারা। তাদের দেখা যাবে প্রায় মাথার ওপরেই। মনে হবে যেন তারা তিনটি এক বিশাল ত্রিভুজের তিনটি কোণে রয়েছে। এখানে একটা কথা মনে রেখ। শরৎকালে সপ্তর্ষি বা কাশ্যপী কোনটিই উত্তর আকাশে ভালভাবে দেখা যায় না। এসময় সপ্তর্ষিকে অস্ত যেতে আর কাশ্যপীকে উদয় হতে দেখা যায়। যাই হোক ধ্রুবতারাকে এতদিনে তোমরা নিশ্চয়ই ভালোভাবে চিনে নিয়েছ। সুতরাং উত্তর দিক কোন্‌টা সেটা খুঁজে নিতে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না। এবারে উত্তরমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে মাথার ওপরে দেখলেই চোখে পড়বে উজ্জ্বল তারা দিয়ে তৈরী ত্রিভুজটি।

তিনটির মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটি হলো অভিজিৎ (Vega)। এর প্রভা 0.04। এটি রয়েছে বীণামণ্ডল বা Lyra তারামণ্ডলে। বীণামণ্ডলটি দেখতে খুবই ছোট, কিন্তু চেনা সহজ। তারামণ্ডলটিকে দেখে মনে হয় যেন একটা ত্রিভুজের সঙ্গে একটা চতুর্ভুজকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। একটু লক্ষ্য করে দেখলেই তোমরা এটিকে চিনে নিতে পারবে। বীণামণ্ডল মধ্যগমন করে 1লা ভাদ্র রাত 9টায় এবং 1লা জ্যৈষ্ঠ ভোর 3টায়।

অভিজিতের পূর্বদিকে যে উজ্জ্বল তারাটিকে দেখবে সেটি হলো দেনেব (Deneb), প্রভা 1.26। এটি রয়েছে হংসমণ্ডল বা Cygnus তারামণ্ডলে। হংসমণ্ডল হলো আকাশের সুন্দর তারামণ্ডলগুলির একটি। এতে আছে 6টি তারা, যাদের দেখে মনে হয় সত্যিই যেন একটা উড়ন্ত হাঁসের মূর্তি। অবশ্য তারামণ্ডলটির আকার অনেকটা একটা 'ক্রশ'-এর মতো বলে এটিকে অনেকে 'উত্তরের ক্রশ' বা Northern Cross ও বলেন। আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তা হলে হংসমণ্ডলে ছায়াপথের কিছুটা অংশও তোমাদের চোখে পড়বে। হংসমণ্ডলের মধ্য গমনের সময় হলো 1লা আশ্বিন রাত 9টায় এবং 1লা আষাঢ় ভোর 3টায়।

ত্রিভুজের তৃতীয় উজ্জ্বল তারাটিকে দেখা যায় অভিজিৎ ও দেনেবের দক্ষিণে। এটির নাম শ্রবণা (Altair), প্রভা, 0.80। এটি রয়েছে শ্যেনমণ্ডল বা Aquila তারামণ্ডলে। শ্রবণাকে চিনে নেওয়া খুবই সোজা, কারণ এর দু'পাশে দুটো ছোট তারা আছে। তারামণ্ডলটিতে একটা উড়ন্ত বাজপাখীর আকৃতি কল্পনা করা হয়েছে। এখানে একটা কথা বলে রাখি। শ্রবণা হলো রাশিচক্রের 27টি নক্ষত্রের একটি, যদিও এটি রাশিচক্রে নেই। এই শ্রবণা নক্ষত্রের নামানুসারেই শ্রাবণ মাসের নাম রাখা হয়েছে।

শ্যেনমণ্ডল মধ্যগমন করে 1লা ভাদ্র রাত 10টায় এবং 15ই জ্যৈষ্ঠ ভোর 3 টায়।

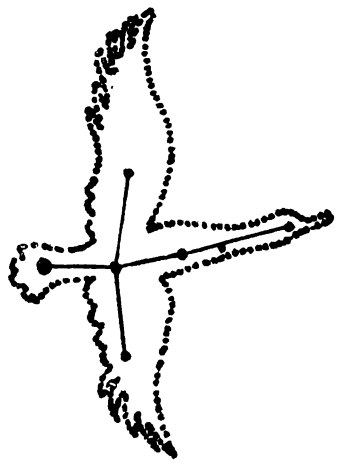

উড়ন্ত বাজ পাখির আকৃতি।

এবারে অভিজিতের ঠিক দক্ষিণ বরাবর যদি দৃষ্টি চালিয়ে যাও তবে দক্ষিণ দিগন্তের কিছুটা ওপরেই একটি উজ্জ্বল তারামণ্ডলকে দেখতে পাবে। ওটাই হলো ধনু-রাশি। রাশিচক্রের এই তারামণ্ডলটিতে বেশ কয়েকটি উজ্জ্বল তারা আছে বলে সহজেই এটিকে চিনে নেওয়া যায়। বলা হয় যে তারামণ্ডলটিতে তীরধনুক হাতে আধা-মানুষ আধা-ঘোড়ার আকৃতি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু চোখে তোমাদের প্রথমেই চোখে পড়বে 'চায়ের পট'-এর মতো একটা আকৃতি যেটা তোমরা সহজেই চিনে নিতে পারবে। চায়ের পট-এর হ্যাণ্ডেলটা থাকবে বাঁ দিকে আর মুখটা থাকবে ডানদিকে।

ধনুরাশিতে দুটি নক্ষত্রও আছে। তাদের নাম পূর্ব আষাঢ়া ও উত্তর আষাঢ়া। পূর্বআষাঢ়া নক্ষত্র হলো তারা-মণ্ডলের E তারাটি। এটি বেশ উজ্জ্বল, প্রভা 1·9। উত্তর আষাঢ়া নক্ষত্র হলো 'G' তারাটি (ছবিতে দেখ)। এটির প্রভা 2·1। এ দুটি নক্ষত্রের নামেই আষাঢ় মাসের নাম রাখা হয়েছে।

ধনুরাশির পশ্চিম প্রান্তের কাছেই ছায়াপথের সবচেয়ে উজ্জ্বল অংশটা রয়েছে। সেজন্যে তারামণ্ডলটিতে বেশ কয়েকটি সুন্দর তারাপুঞ্জ দেখতে পাওয়া যায়। আকাশ পরিষ্কার থাকলে, খালি চোখেই তাদের দু'একটাকে হয়তো তোমরা দেখতে পাবে। ধনুরাশি মধ্যগমন করে ভাদ্র রাত 4টায় এবং 1লা জ্যৈষ্ঠ ভোর 3টায়।

ধনুরাশির পূর্ব দিকে, একটু ওপরে রয়েছে রাশিচক্রের আর একটি রাশি, নাম মকর রাশি। এটিকে চট্ করে খুঁজে বের করতে তোমরা হয়তো নাও পারো, কারণ এতে কোনও উজ্জ্বল তারা নেই। কিন্তু এটিকে খুঁজে বের করার একটা সহজ উপায় আছে। ধরো, অভিজিৎ আর শ্রবণাকে একটা রেখা দিয়ে যুক্ত করলে। এখন এই রেখাটিকে যদি ঠিক অতটাই দক্ষিণ দিকে বাড়িয়ে দাও তা হলেই খুঁজে পাবে মকর রাশিকে। আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে, তা হলে হয়তো তারামণ্ডলটির সব কটি তারাই তোমাদের চোখে পড়বে। মনে হবে ঠিক যেন একটা উল্টো করে রাখা বাঁশের টোকা। অনেকের কাছে আবার আকৃতিটাকে একটা নৌকো বলেও মনে হতে পারে। যাই হোক, যদি তোমরা তারামণ্ডলটিতে মকর নামক বৃহৎ সামুদ্রিক জন্তুটিকে খুঁজে না পাও তবে হতাশ হওয়ার কিছুই নেই।

মকর রাশির পশ্চিম প্রান্তের উত্তর দিকে যে তারাটিকে দেখা যায় (ছবিতে ω-তারাটি) সেটি আসলে একটি

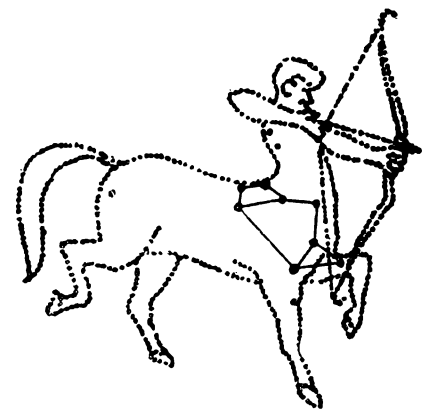

তীর ধনুক হাতে আধা মানুষ আধা ঘোড়ার আকৃতি।

যুগল তারা বা double star। শুধু চোখেই তোমরা দুটিকে হয়তো আলাদাভাবে দেখতে পাবে, তবে তার জন্যে একটু চেষ্টা করতে হবে। রাশিচক্র থাকা সত্ত্বেও, মকর রাশিতে কোনও উজ্জ্বল তারা নেই বলে এর কোনও তারাকেই নক্ষত্র বলে গণ্য করা হয় না। মকর রাশি মধ্যগমন করে 1লা আশ্বিন রাত 9টায় এবং 1লা আষাঢ় ভোর তিনটায়।

ধনু ও মকরের পর আবার উত্তর আকাশে ফিরে আসা

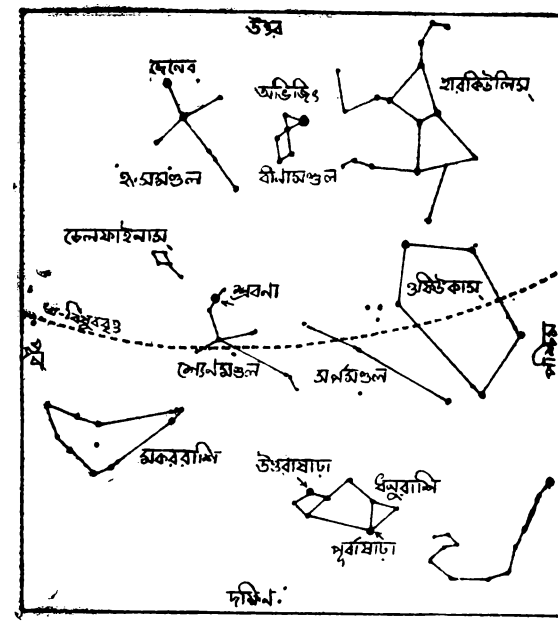

শরৎকালের আকাশ।

যাক্। এখানে বীণামণ্ডলের ঠিক পশ্চিমে দেখতে পাবে হারকিউলিস্ (Hercules) তারামণ্ডলটিকে। বলা হয় এই তারামণ্ডলটিতে প্রায় 140টি তারা আছে যেগুলি শুধু চোখে দেখতে পাওয়া যায়। আসলে কিন্তু তাদের বেশির ভাগই হলো খুবই ক্ষীণ, তাদের প্রভা 3-এর বেশি। মাত্র তিনটি তারা আছে যাদের প্রভা 3এর চেয়ে কম।

যাই হোক, আকাশে হারকিউলিস্‌কে চিনে নিতে খুব একটা অসুবিধে হয় না। তারামণ্ডলটিকে চেনবার সব চেয়ে সহজ উপায় হলো এতে ইংরেজি অক্ষর Hএর আকৃতিটা খুঁজে বের করা। তারপর বাকি তারামণ্ডলটির আকার সহজেই চিনে নেওয়া যায়।

সব মিলে হারকিউলিস্ তারামণ্ডলটিকে দেখতে ঠিক যেন হাঁটু গেড়ে বসা এক হাতকাটা একটি মানুষের আকৃতির মতো। মধ্যগমনের সময় তারামণ্ডলটিকে দেখা যায় ঠিক মাথার ওপরে। যদি সে সময় উত্তরমুখো হয়ে তারামণ্ডলটিকে দেখ, তবে সহজেই সেই এক হাতওয়ালা মানুষটিকে চিনে নিতে পারবে।

হারকিউলিস্ মধ্যগমন করে 1লা শ্রাবণ রাত 9টায় এবং 1লা বৈশাখ ভোর 3টায়।

হারকিউলিসের ঠিক দক্ষিণে রয়েছে ওফিউকাস্ (Ophiuchus) তারামণ্ডল। ওফিউকাস্ মানে হলো 'সর্পধারী'। তারামণ্ডলটিতে কল্পনা করা হয়েছে সাপ হাতে-ধরা এক মানুষের আকৃতি। অবশ্য এখানে সাপটা দেখানো হয় একটা আলাদা তারামণ্ডলে যার নাম সর্পমণ্ডল বা Serpens তারামণ্ডল। ওফিউকাস্‌ের কেবলমাত্র মানুষটির আকৃতি কল্পনা করা হয়।

ওফিউকাস্‌কে চেনার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো হারকিউলিসের দক্ষিণে বিশাল পঞ্চভুজের আকারটা খুঁজে বের করা। তারামণ্ডলটি খুবই বিশাল বলে প্রথমে পঞ্চভুজের পাঁচটি তারাকে খুঁজতে হয়তো একটু অসুবিধা হবে। কিন্তু একটু চেষ্টা করলেই দেখবে চট্ করে খুঁজে পেয়ে যাবে।

ওফিউকাস্ তারামণ্ডলটি রয়েছে ঠিক মধ্য আকাশে। খ-বিষুবরেখা ঠিক এর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে। তা ছাড়া খ-বিষুববৃত্তের ওপর এটি রয়েছে দুটি বিষুব-বিন্দুর ঠিক মাঝখানে। ওফিউকাস্ মধ্যগমন করে 1লা শ্রাবণ রাত 9 টায় এবং 1লা বৈশাখ ভোর 3 টায়।

যদি তোমরা ওফিউকাসের সাপ, মানে সর্পমণ্ডলকে খুঁজে বের করতে চাও তা হলে ওফিউকাস ও ধনুরাশির ঠিক মাঝখানে তার অর্ধেকটা অংশ দেখতে পারো। এটা হলো সাপের ল্যাজের দিকটা। সাপের বাকি অর্ধেকটা, মানে মাথার দিকটাকে দেখা যায় ওফিউকাসের পশ্চিমে।

7/UF কলেজ রোড, নয়াদিল্লী-1

● মজার ছবি

প্রনব হোড়

লাক্ষাকীট

অমিয় পাল

বিশাল এই পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় পরিবেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে কীট ও পতঙ্গরা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এদের ভূমিকাও কিছু উপেক্ষার নয়। রেশমকীট থেকে মূল্যবান রেশমী সুতো, মৌমাছিদের কাছ থেকে সুমিষ্ট মধু আহরিত হয় একথা তো আমাদের সকলেরই জানা। বর্তমানকালে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে লাক্ষার ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু বর্তমানকালেই বা বলি কেন, পুরাকালেও লাক্ষার ব্যবহারের কথা আমাদের ইতিহাস এবং প্রাচীন পুঁথিপত্রে উল্লেখিত আছে।

এই লাক্ষা বস্তুটি কি? আসলে লাক্ষা বস্তুটি অতিক্ষুদ্র একজাতীয় পতঙ্গের দেহনিঃসৃত রঞ্জন জাতীয় পদার্থ। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় লাক্ষা নিঃসরণকারী এই পতঙ্গটিকে বলা হয় টাকার্ডিয়া লাক্ষা (Tacardia Lacca)। এরা উদ্ভিদের কচি শাখাতে বিশেষ ঋতুতে জমায়েত হয়। তবে সমস্ত উদ্ভিদের শাখাতে এরা জমায়েত হতে পারে না। পলাশ, কুসুম, কুল প্রভৃতি গাছের শাখাই হলো এদের পক্ষে উপযুক্ত জমায়েতের স্থান। প্রায় চার শত প্রকার প্রজাতির উদ্ভিদের শাখাতে লাক্ষাকীট বাসা বাঁধতে পারলেও তা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

লাক্ষা প্রধানতঃ দুই ধরনের। কুসমী ও রঙ্গীন। কুসুম গাছে যে লাক্ষা উৎপাদিত হয় তাকে কুসমী লাক্ষা এবং কুসুম ব্যতীত অন্যান্য গাছে যে লাক্ষা উৎপন্ন হয় তাকে রঙ্গীন লাক্ষা বলে।

ভারতবর্ষ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি লাক্ষা উৎপাদনকারী দেশ। লাক্ষা বিদেশে রপ্তানি ক'রে ভারতবর্ষ প্রতি বৎসর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ক'রে থাকে।

আমাদের দেশের লাক্ষাচাষীরা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ব্যাপক হারে লাক্ষার চাষ করে থাকে।

লাক্ষাকীটের জীবন ইতিহাস—লাক্ষার আবরণযুক্ত শাখাকে টুকরো টুকরো ক'রে চাষীরা অপর গাছের কচি শাখায় বেঁধে দেয়। কয়েকদিনের মধ্যেই উপযুক্ত পরিবেশে লাক্ষাকীট লাক্ষার আবরণ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। লাক্ষাকীটের এই অবস্থাকে বলা হয় নিম্ফ (Nynph)। নিম্ফ থেকেই লাক্ষাকীট জীবনচক্র শুরু করে। নিম্ফের দেহ আকৃতিতে অনেকটা নৌকার মতো। এরা লম্বায়

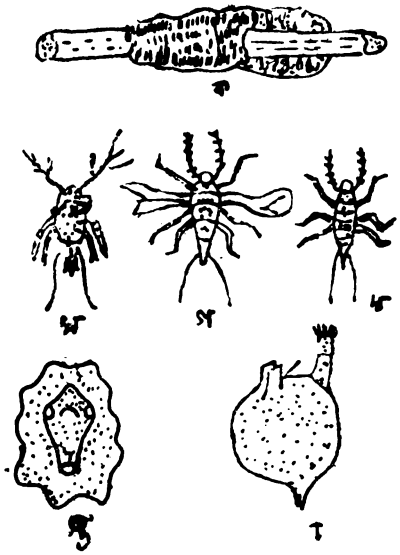

ক—কচি পাতার উপর লাক্ষার আবরণ। খ—নিম্ফ। গ—লাক্ষা কীট পুরুষ পাখাবিশিষ্ট। ঘ—পাখাহীন পুং লাক্ষাকীট। ঙ—আবরণের ভিতরে স্ত্রী লাক্ষাকীট। চ—আবরণের বাইরে স্ত্রী লাক্ষাকীট।

0·65 থেকে 0·75 মিঃ মিটার' এবং চাওড়ায় 0·25 থেকে 0·35 মিঃ মিটার হয়। এদের রং লাল; প্রত্যেক নিম্ফের তিনজোড়া পদ, মুখের অগ্রপ্রান্তে একজোড়া শৃঙ্গ এবং পশ্চাৎদেশে একজোড়া রোম থাকে। নিম্ফগুলির স্ত্রী-পুরুষ ভেদাভেদ থাকে। পুরুষ নিম্ফদের ডানা থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে। পুরুষ নিম্ফ অপেক্ষা স্ত্রী নিম্ফ অধিক দেখা যায়। কয়েক দিনের মধ্যেই অজস্র নিম্ফ গাছের কাঁচি শাখাগুলিকে ছেয়ে ফেলে। এরা প্রথম অবস্থায় খুব চঞ্চল থাকে এবং উপযুক্ত আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। ঠিকমত আশ্রয়স্থল খুঁজে পাওয়ার পর দেহস্থ চোষক অঙ্গ প্রোবোসিস্ উদ্ভিদের কলায় প্রবেশ করিয়ে রস শোষণ করে। এ সময় এরা স্থির হয়ে অবস্থান করে এবং এদের ত্বকের নিম্নে অবস্থিত লাক্ষাগ্রন্থি থেকে রঞ্জন জাতীয় পদার্থ নিঃসৃত হয়। দেহের প্রায় সমস্ত অংশ জুড়েই লাক্ষাগ্রন্থি থাকে এবং সমস্ত গ্রন্থি থেকেই রসের ক্ষরণ হয়। এই রসই শুকিয়ে গিয়ে দেহের চারদিকে একটি আবরণ গঠন করে। ইত্যবসরে লাক্ষাকীট তিনবার খোলস ত্যাগ করে। খোলস এবং লাক্ষাগ্রন্থির ক্ষরণ যুগ্মভাবে কীটের চারদিকে একটি আবরণ গঠন করে। এরপর নিম্ফের দেহাস্থ অধিকাংশ অঙ্গ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

পুরুষ নিম্ফেরা ক্ষণজীবী। কারণ এদের প্রোবোসিস্ বা

চোষকঅঙ্গ না থাকায় এরা খাদ্য গ্রহণে অক্ষম, তাই এরা তাড়াতাড়ি মারা যায়। নিষেকের পর স্ত্রী নিম্ফ আকারে বড় হয়, এদের চেহারার পরিবর্তন হ'তে থাকে। পদ, শুঙ্গ প্রভৃতি অবলুপ্ত হয়ে দেহটি একটি থলির মত দেখায়। এই অবস্থায় স্ত্রী-কীট ডিম পাড়ে। ডিমগুলি এদের দেহের নিচে চাপা থাকে। এই ডিমগুলি পরিস্ফুট হয়ে সরাসরি নিম্ফে পরিণত হয়। নিম্ফগুলি রন্ধ্রপথ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। ইত্যবসরে মাতৃকীট মারা যায়।

গাছের শাখাকে বেষ্টন করে লাক্ষাকীটের দেহনিঃসৃত জৈবিক পদার্থের রজন জাতীয় আবরণটির পরিচয় হলো 'ল্যাক্ ক্রপ'। শাখা থেকে ঐ জৈবিক আবরণটিকে পৃথক করে নিলে একে চিহ্নিত করা হয় স্টিক ল্যাকরূপে। স্টিক্ ল্যাককে বিশেষ পদ্ধতিতে পরিশুদ্ধ করে যে বস্তু পাওয়া যায় তাই হলো শেল্যাক্ বা লাক্ষা।

এ শেল্যাকই আমাদের গৃহশয্যা, ঔষধপত্র, ছাপার কালি, নানা প্রসাধনসামগ্রী চর্মশিল্প, নৌকাজাহাজ ইত্যাদির তলায় জল নিরোধকরূপে ব্যাপক ব্যাবহৃত হচ্ছে।

বলরামপুর, রাঙাডি, পুরুলিয়া

ব্লটিং পেপার আবিষ্কার

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

ইংলণ্ডে বার্কশয়ার নামে একটি জায়গা আছে। সেখানকার কোন এক কাগজকলের মালিক একদিন ভয়ানক একটা ভুল করে বসলেন। কাগজ তৈরির জন্যে আগে থেকে কাঠের মণ্ড প্রস্তুত করা ছিল। সেই মণ্ডকে কাগজকলে পাঠানোর আগে তাতে মেশাতে হত আরও এক ধরনের মণ্ড। তারপর ভারি রোলার চালিয়ে তাকে পাতলা করে কাগজ তৈরি করার কথা।

কলের মালিক সেদিন দ্বিতীয়বার মণ্ড যোগ করতে একেবারেই ভুলে গেলেন। কেবল কাঠের মণ্ডটাকেই পাঠিয়ে দিলেন কারখানায়। যথারীতি কাগজ তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু কাগজকলের মালিক কাগজের নমুনা দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এ কী চেহারা হয়েছে কাগজের! উপরটা একেবারে খস্‌খসে, লিখতে গেলে কালি চুঁইয়ে যায়। কতকগুলো মণ্ড অকারণে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মালিকের গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছিল! অনেকগুলো টাকা নষ্ট হয়ে গেল আজ।

মালিক মনকে বোঝালেন, ব্যবসায়ে লাভক্ষতি দুইই আছে। এখন এই কাগজগুলোকে অন্য কাজে লাগানো যেতে পারে কিনা সেই চিন্তাই করতে লাগলেন।

একদিন হাতে কোন কাজ ছিল না। কলের মালিক সেই কাগজের একখানা টেনে নিয়ে বসলেন। প্রথমে মাড় ঘষে ঘষে দেখতে লাগলেন স্বাভাবিক কাগজের মত হয়ে গেলেই বাজারে ছেড়ে দেবেন। কিন্তু কোন চেষ্টাই ফলবতী হলো না। যত বারই কলম ঠেকালেন ততবারই দেখতে পেলেন লেখা কিছুতেই যাচ্ছে না। বিরক্ত হয়ে কলম ফেলে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে রইলেন।

এক সময় তাঁর নজরে পড়ল কাগজের কিনারাটা কলমের নিবে ঠেকে আপনা থেকে কালি শুষে নিচ্ছে। কি ভেবে ভদ্রলোক এক ফোঁটা কালি ফেলে দিলেন কাগজের উপর। দেখলেন কালি পড়ামাত্রই কাগজটা শুষে নিল।

ভদ্রলোকের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এসে গেল। এই কাগজকে লেখার কাজে ব্যবহার না করে কালি শোষণের কাজে ব্যবহার করলে কেমন হয়? এমনিতে লেখার সময় কখনও কখনও কালি পড়ে গিয়ে কাগজকে বিশ্রী করে দেয়। কালি না শুকালে কাগজের পাতা উল্টিয়ে তাড়াতাড়ি লেখাও যায় না। এই শোষক কাগজের এক টুকরো লেখার কাছে থাকলে অনেক সুবিধা হবে। মুখে হাসি ফুটে উঠলো ভদ্রলোকের। নতুন ধরনের এই কাগজের গুণাগুণ বাজারে ফলাও করে প্রচার করলেন। দেখতে দেখতে বেড়ে উঠলো চাহিদা। মাড় না দেওয়া কাগজ তিনগুণ দামে বিকি হয়ে গেল। নাম হলো ব্লটিং পেপার। আশেপাশে অন্যান্য কলের মালিক হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। ব্লটিং পেপার তৈরি করবার ফরমুলা তাঁদের জানা নেই!

বেঁচী গ্রাম, হুগলী।

ফালি কাগজের হেঁয়ালি

অরূপরতন ভট্টাচার্য

একটা সরু লম্বা কাগজের ফালির দুটো প্রান্তে আঠা লাগিয়ে ছবিতে যেমন দেখা যাচ্ছে তেমনি প্রান্তহীন একটি বেলনাকার তৈরি করা গেল। নাম দেওয়া যাক—ক।

এই আকারটি দুটি পিঠ আছে আর সেই সঙ্গে দুটি ধার। এখন যদি এটিকে দুটি ধার থেকে সমান দূরে রেখে ঠিক মাঝখান দিয়ে বরাবর কেটে যাওয়া যায়, তা হলে কি হবে? নিশ্চয় এটি দুটি বেলনাকার চওড়া ফালিতে পরিণত হবে। আগের ফালিটা যত চওড়া ছিল এ ফালি দুটো চওড়ায় অবশ্য তার চেয়ে সরু।

ব্যাপারটায় নতুনত্ব কিছু নেই। একটা ফালির মাঝখান দিয়ে কাঁচি চালিয়ে গেলে দুটো ফালি হওয়ার কথা এবং হবেও তাই। এরও প্রত্যেকটা ফালির দুটো পিঠ এবং দুটো ধার।

কিন্তু সরু লম্বা ফালিকে আঠা দিয়ে জুড়ে গোল করার আগে যদি একটা প্যাঁচ দিয়ে নেওয়া হয়, তা হলে?

ছবি দেখলেই বোঝা যাবে প্যাঁচটা কিরকম হবে।

এই যে একটা প্যাঁচ দেওয়ার কথা বলছি, এটা আসলে 180 ডিগরির একটা মোচড়। এই মোচড় একে এমন এক স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে যার ফলে তৈরি হয়েছে সুন্দর এক জ্যামিতিক হেঁয়ালি। বেলনাকার ফিতেটির নাম মোবিয়াস স্ট্রিপ, খ বললে এই স্ট্রিপটিকেই আমরা বুঝবো।

এটিতে কটা তল রইল আর কটা ধার?

আপাত দৃষ্টিতে উত্তর এত সহজ যে প্রশ্ন করার কোনো অর্থ আছে বলে মনে হয় না। অর্থাৎ উত্তর মনে হবে, পূর্বের (ক) মতনই দুটো তল এবং দুটো ধার। আসলে কিন্তু তা নয়। হেঁয়ালিটি এখানেই।

তল আর ধারের হিসেব করবার জন্যে নিজে একটা মোবিয়াস স্ট্রিপ তৈরি করে নিতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়।

আগে কটা পিঠ বা তল আছে তার হিসেব করা যাক। এই যে গোলাকৃতি ফিতেটি দেখা যায় এর যে কোনো একটা বিন্দুতে পেনসিল রেখে মাঝ বরাবর দাগ টেনে যাই। পেনসিল ঘুরে যাচ্ছে। একবারও কাগজ থেকে না তুলে যদি পেনসিল ঘুরিয়ে যাওয়া হয়, তা হলে কি হবে? কাগজের পিঠের যে বিন্দুতে

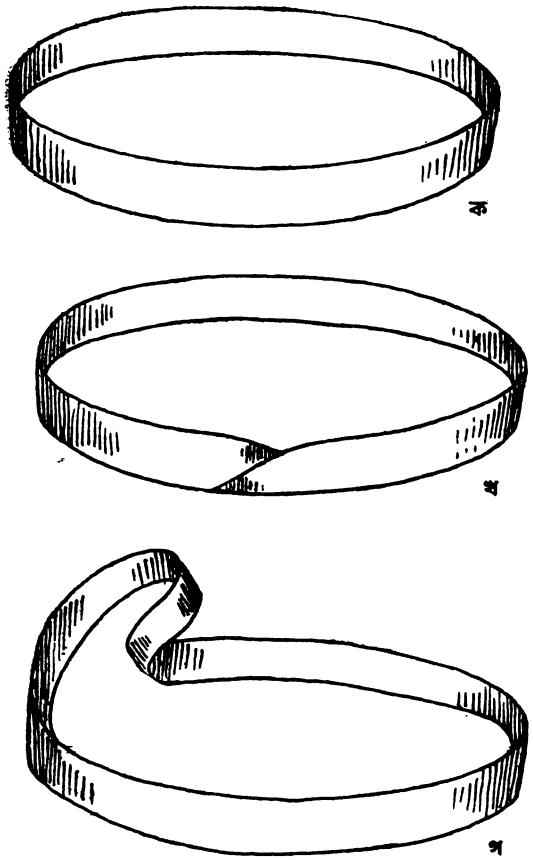

যাত্রা শুরু হয়েছিল, তল দুটো হলে, পেনসিল কখনোই ঘুরে সেখানে এসে পৌঁছোবে না। কিন্তু পেনসিল একবারও তুলে না নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে দেখব, যাত্রারম্ভের বিন্দুতে এসেই পেনসিল পৌঁছে যাচ্ছে অবশেষে। তল একটা না হলে এরকম ব্যাপার কখনো হতে পারে না।

আর এই গোলাকার ফিতের ধার কটা?

তলের মতনই এখানে দেখে যেন মনে হয় দুটোই হবে। কিন্তু এবারেও একটা ধারের উপরে পেনসিল বসিয়ে ঘুরিয়ে গেলে দেখা যাবে, যে বিন্দু থেকে পেনসিল ঘোরোনো শুরু হয়েছিল, পেনসিল এসে পৌঁছে যাচ্ছে সেই বিন্দুতেই একবারও পেনসিল না তুলে নিয়েই।

অথচ কাগজের ফালির প্রান্ত মুখ জুড়ে দেওয়ার আগে দুটো তল আর দুটি ধার—ব্যাপারটা হেঁয়ালি মার্কা নয় কি?

এখন আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া গোলাকার ফালিটার মাঝ বরাবর যদি কাঁচি চালিয়ে যাওয়া যায়, যতক্ষণ না কাঁচি ঘুরে আসে যেখান থেকে কাগজ কাটা শুরু হয়েছিল সেখান পর্যন্ত। তা হলে কি হবে?

কার কতটা বুদ্ধি আছে পরীক্ষা করা যায় এই প্রশ্নের উত্তর চেয়ে। মনে হবে নিশ্চয় আগের মত দুটো ফালি বেরিয়ে আসবে। অবশ্য চওড়ায় অর্ধেক। আসলে কিন্তু তা নয়। কাঁচি কাগজ নিয়ে নিজেরা পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, আগের মতনই গোলাকার একটা ফালিই হবে, দৈর্ঘ্যে দ্বিগুণ এবং চওড়ায় অর্ধেক।

এই যে ফালিটা, এর ধরন কি ক-এর মতন হবে? না খ-এর মতন? ক-এর মতন মানে কোনো মোচড় নেই আর খ-এর মত মানে 180 ডিগরির একটা মোচড়।

কিন্তু যে ফালিটা আসলে বেরোবে সেটা ক-এর মতনও নয়। খ-এর মতনও নয়। সেটা 360 ডিগরি পাক দেওয়া একটা গোলাকার কাগজ, দেখতে গ-এর মতন।

এইরকম 360 ডিগরি মোচড় দেওয়া দু মুখ জোড়া কাগজের ফালির কটা পিঠ আর কটা ধার? খ-এ একটা পিঠ আর একটা ধার থাকলে কি হবে এতে আছে দুটো পিঠ আর দুটো ধার।

যদি কাঁচি হাতে নিয়ে দু ধার থেকে সমান দূরে মাঝ বরাবর কেটে যাওয়া যায় তা হলে এইরকম গোল কাগজের বেলায় কি দেখা যাবে? খ-এর বেলায় যা হয়েছিল, এখানেও কি সেরকম দ্বিগুণ লম্বা একটা গোলাকার ফালি বেরিয়ে আসবে?

কে অনুমান করতে পারে?

এ হেঁয়ালির উত্তর অনুমান করা সহজ নয়।

এখানে শিকলি আটা গ ধরনের এক জোড়া কাগজের ফালি পাওয়া যাবে। জোড়ের প্রত্যেকটার দৈর্ঘ্য আসলটার মতনই, কেবল চওড়ায় অর্ধেক।

কিন্তু মোচড় দেওয়া কাগজের ফালি নিয়ে চূড়ান্ত ধরনের একটা হেঁয়ালির কথা বলা যেতে পারে।

যে খ ধরনের অর্থাৎ 180 ডিগরি মোচড় দেওয়া গোলাকার কাগজের কথা বলা হয়েছে, সেইরকমই একটা কাগজ নেওয়া যাক। এর মাঝ বরাবর কেটে গেলে গোলাকার ফালি লম্বার দ্বিগুণ কিন্তু চওড়ায় অর্ধেক। কিন্তু মাঝ বরাবর না কেটে কেউ যদি এমন করে কাটে যাতে ফালির একদিকে থাকে $\frac{1}{3}$ ভাগ, অন্যদিকে $\frac{2}{3}$ ভাগ তা হলে শেষ পর্যন্ত কেটে গোড়ায় ফিরে এলে ব্যাপারটা কি হবে?

এখানেও কি আগের মতন দ্বিগুণ লম্বা একটা ফালি বেরোবে? যে জন অনুমানকে কল্পনায় আরও একটু উর্বরা করে তুলতে চাইবে. সে বলবে, না, দ্বিগুণ হয়তো নয়। তিন গুণই হবে।

না, হলো না।

এখানে আসবে শিকলি আঁটা এক জোড়া কাগজের ফালি। এর একটা দৈর্ঘ্যে আসলটার মতনই, অন্যটা তার দ্বিগুণ। ভাবতে পারা যায়, কাটার ফলে এরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হবে! যেটা দৈর্ঘ্যে আসলটার মতন, সেটা খ ধরনের অর্থাৎ তাতে 180 ডিগরির একটা মোচড় আছে আর দ্বিগুণ লম্বা ফালি গ ধরনের, 360 ডিগরির মোচড় সেখানে।

130-E কাঁকুলিয়া রোড, কলকাতা-29

ভাবতে অবাক লাগে, সারা পৃথিবী এখন প্রায় 10,000 রোবোট কর্মরত। কেউ কাজ করছে বাড়ীতে, কেউ বা কলকারখানায়। রোবোট নিয়ে সাম্প্রতিকতম গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্যে ভরা

অরূপরতন ভট্টাচার্যের

রোবট এল কেমন করে 6·00

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ 8/1A শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-73

গো-পাদপ

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

গল্পের গরু গাছে ওঠে। আর সত্যিসত্যি যদি তাই হয় তা হলে সেই গরুকে বলব গেছো গরু। কিন্তু যদি একটু অন্যরকম ব্যাপার ঘটে অর্থাৎ কোনও গাছ যদি গরুর মতো দুধ দেয় তা হলে সেই গাছকে কি বলব? গরু গাছ বা গোপাদপ। গো-পাদপের অস্তিত্ব কিন্তু মোটে কাল্পনিক নয়। মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশে গভীর বনে এইরকম বৃক্ষ আছে যার আঠা গরুর দুধের মতো পান করা যায় এবং স্থানীয় লোকেরা আগ্রহের সঙ্গে তা পান করে। ঐ গাছের নাম ব্রসিমাম ইউটিলে। এই গাছ আমাদের দেশের কাঁঠাল গাছের স্বজাতি।

ক—গো-পাদপ গাছ। খ—পাতা। গ—ফুল।

গাছটি উচ্চতায় 20-25 মিটার, কাণ্ড সরল, উপরের দিকে ছোট ছোট ডালপালা থাকে, নিচের দিকে ডালপালা শুকিয়ে ঝরে যায়। পাতা বেশ বড়, 15-25 সেঃ মিঃ লম্বা, আগার দিকে বিশেষ সরু। গাছের ছাল বেশ পুরু। পাতার সঙ্গে উপপত্র থাকে। তা কাঁঠাল গাছের মতো শাখার ডগাটিকে প্রথমে ঢেকে রাখে। পরে ঝরে যায় আর প্রশাখা গাঁটে গাঁটে গোলাকায় দাগ রেখে যায়। ফুল খুব ছোট ছোট, একটি ছোট নরম মোটা ডাঁটার উপর অসংখ্য ফুল হয়। স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে ফুল দুই প্রকার হয়। একটি পুষ্পগুচ্ছে একটিমাত্র স্ত্রী ফুল হয়, সেটি থাকে উপরের দিকে মধ্যস্থলে আর পুংপুষ্পগুলি তার চতুর্দিকে থাকে। ফল গোলাকার 2-2·5 সেঃ মিঃ ব্যাস বিশিষ্ট। ফলে একটিমাত্র সাদা রং-এর বীজ থাকে।

এই গাছের আঠা দুধের মতোই তরল। একটি গাছে যথেষ্ট পরিমাণে দুধ বা আঠা থাকে। গাছের কাণ্ডে ক্ষত করলে প্রায় এক ঘণ্টায় এক লিটার দুধ পাওয়া যায়! এই দুধ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। কিছুদিন নিয়মিত পান করলে শরীরে মেদ বৃদ্ধি হয়। কিছুক্ষণ রেখে দিলে উপরে পাতলা সর পড়ে। এই দুধ টাটকাই পান করতে হয়।

ভারতে এই গাছ লাগানোর কথা দেড়শ' বছর আগেই চিন্তা করা হয়েছিল। শিবপুর বোটানিক গার্ডেনের অধ্যক্ষ ওয়ালিখ সাহেব বীজ এনে এখানে চারা করার চেষ্টা করেছিলেন 1836 খৃষ্টাব্দে। কিন্তু তাঁর চেষ্টা ফলবতী হয় নি। 1879-80 সালে বোম্বাইতেও এই রকম প্রচেষ্টা হয়, তাও সফল হয় নি। পুনরায় 1947 সালে বোটানিক গার্ডেন ও কলিকাতা মিউজিয়ামে ঐ গাছের বীজ এনে লাগানো হয়। বোটানিক গার্ডেনে বীজ অঙ্কুরিত হলেও চারাগাছ বাঁচানো সম্ভব হয় নি।

গাছের বৈজ্ঞানিক নাম প্রথমে দেওয়া হয় "গালাক্টো-ডেণ্ড্রন ইউটিলে।' পরে সে নাম বদল করে এই গাছকে 'ব্রসিমাস গালাক্টোডেণ্ড্রন' বলা হত। এখন উদ্ভিদের নামকরণের নিয়মানুসারে এই গাছের নাম দেওয়া হয়েছে 'ব্রসিমাম ইউটিলে।'

391 শরৎ চ্যাটার্জি রোড, হাওড়া-3

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

রোবটে গণ্ডগোল

প্রসাদ সেন

শেষ পর্যন্ত হাসি চেপে অভীক টেলিফোনে বললো, 'ভাই ভাস্বর, রোবটটা তোমাকে নাকানি-চুবানি খাওয়াচ্ছে জেনে দুঃখিত। আসলে যান্ত্রিক ত্রুটির জন্যে, বিশেষ করে কারিগরীবিদ্যার অভাবেই ওই গণ্ডগোল হচ্ছে। আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। দেখি কিছু করতে পারি কিনা।'

সশব্দে টেলিফোন রেখে একা একাই হাসল অভীক। আরে, ফিজিক্সের স্যার সুবর্ণগোলক সমাজপতি নক্সা দিলেই ভাস্বর সেটা নিখুঁতভাবে বানাতে পারবে? স্যারও যেমন। অভীকের মত একটা প্রতিভাকে আমল দিলেন না। যাক গে, এবার সে দেখিয়ে দেবে বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে কার যোগ্যতা বেশি।

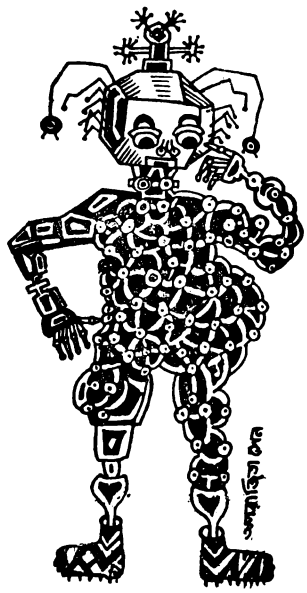

ইরে বাব্বা! এত বড় রোবট?

আধ ঘণ্টাও হয় নি, একটা লরিতে চেপে ভাস্বরের তৈরি রোবটটা যখন অভীকদের বাড়ির দরজায় নামল, একেবারে হা হয়ে গেল অভীক। ইরে বাব্বা! এত বড় রোবট? আর কি তার ছিরি! দুটো দিক দেখতে দু' রকম। অসংখ্য চৌকো আর গোল গোল টিউবের যান্ত্রিক দেহটার উপরে অ্যান্টেনা সহ চৌকো মাথার মাঝখানে দুটো ড্যাবডেবে চোখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অভীককে দেখছে। মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি। দরজা পেরিয়ে ঘরে ঢুকে কোমরে একটা হাত আর গালে একটা হাত রেখে বললো, 'নমস্কার, বৈজ্ঞানিক অভীক।'

ওকে বসবার জন্যে ষ্টিলের একটা টুল এগিয়ে দিয়ে অভীক বললো, 'ভাস্বর বললো তোমার যন্ত্রে গণ্ডগোল আছে। ভয় নেই আমি সারিয়ে দেব।'

একটা যান্ত্রিক গলায় রোবট হেসে উঠল। 'কোন গণ্ডগোল নেই। আসলে তোমার বন্ধু ভাস্বরের জ্ঞানগম্যি কিস্‌সু নেই। কি করে যে এরা বৈজ্ঞানিক হবার স্বপ্ন দেখে। যাক্, এবার আমায় কি করতে হবে চটপট বলে ফেল দেখি।'

'আমি তোমাকে পরীক্ষা করব। টুঁ শব্দটি না করে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবে। বাড়াবাড়ি করলে সমস্ত নাটবল্টু খুলে তোমাকে ছন্নছাড়া করে দেব।'

রোবট জ্বলে উঠল যেন। বললো, 'ওঃ তোমার সাহস দেখছি আরও বেশি।'

'কোন কথা নয়। এবার আমাকে কাজ করতে দাও।' অভীক ইলেকট্রনিক টেস্টার দিয়ে রোবটের প্রত্যেকটা জোড়া পয়েন্ট, প্লাগ, নাটবল্টু, স্ক্রু সব পরীক্ষা করে বলে, 'নাঃ, জোড়া লাগানোয় কোন ভুল নেই। কিন্তু তোমার রোগটা কি বল ত?'

গং গং করে রোবট হেসে উঠে বলে, 'বা-রে, বেশ মজার কথা বলছ তো? আমার রোগটোগ কিছু নেই বাপু। থাকলে তো তোমারই বের করার কথা।'

'হুম্।' অভীক বলে, 'ভাস্বর বলছিল ফিজিক্সের কঠিন অংক করতেও তোমার বাধে না—'

'বাধবে কেন? তোমার বন্ধু চেয়েছিল আমাকে দিয়ে ইস্কুলের হোমটাস্ক করিয়ে নিতে। খুব চালাক ছোকরা।'

'আচ্ছা বলত, অভীক প্রশ্ন করে, 'রেডিয়ামের অর্ধায়ু 1622 বৎসর-এর মানে কি?'

গড়গড় করে রোবট বলে গেল, 'রেডিয়ামের বর্তমান ভর যদি 1 গ্রাম হয় তবে 1622 বৎসর পরে তার অর্ধেক হবে।'

'গুড্।' ভাষাতত্ত্বের সুইচ টিপে অভীক বলে, 'অ দিয়ে কয়েকটা শব্দ বলো।'

এক নিঃশ্বাসে রোবট বলে যায়, অংশভাক অকণ্ঠবদ্ধ অকৃতেষ্টিতা অক্ষবাট অজহল্লিঙ্গ অজবীথি অববেক্ষক—

'আঃ থাম। এই সব বিদ্‌ঘুটে শব্দ ছাড়া আর কিছু জান না?' ধমকে ওঠে অভীক, 'এবার ঋ দিয়ে বল।'

'ঋকৃথ ঋতান্নত ঋষ্টি—'

'হয়েছে হয়েছে। কোথা থেকে জোগাড় করেছ এসব?'

মুচকি হেসে রোবট বলল, 'তবু তো ক্ষ দিয়ে শোননি এখনো। ক্ষণদা ক্ষন্তব্য ক্ষিতিরূহ ক্ষীরপ ক্ষুঁয়া ক্ষুপ—'

'থামো থামো।' দু' কান চেপে অভীক চেঁচিয়ে ওঠে, 'এসবের মানে জানা আছে তোমার?'

'নিশ্চয়। তুমি বলতে পারবে? বল ত ভপঞ্জর মানে কি?'

একটু ঘাবড়ে গিয়ে অভীক প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে চট করে বলে ওঠে,

'তুমি নামতা জান?'

'হোঃ, ওসব তো বাচ্চাদের কাজ।'

'তবু তিনের ঘরের নামতা বল দেখি?'

ফিক করে হেসে ফেলে রোবট। তারপর গড়গড়িয়ে বলতে থাকে, 'তিনেক্কে তিন, তিন দু'নে ছয়, তিনতিরিক্কে আট—'

'অ্যাঃ, পাগল নাকি? তিনতিরিক্কে আট হয়?'

'হয়।' গম্ভীর গলায় রোবট বলে, 'তিনতিরিক্কে আট, তিন চারে বার, তিন পাঁচে—'

'থামো হে গর্দভ।' অভীক ধমকে ওঠে, 'তিনতিরিক্কে নয় বুঝলে বোকারাম? নাও, আবার বল।'

'তিনেক্কে তিন, তিন দু'নে ছয়, তিনতিরিক্কে আট—'

'ওঃ অংকের মেশিনে গণ্ডগোল হয়ে আছে। দেখি তোমার পেটের ইস্‌কুরুপটা? বোধ হয় ঢিলে হয়ে গেছে।'

স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে অভীক নির্দিষ্ট স্ক্রুতে ছোঁয়াবার আগেই রোবট চেঁচিয়ে ওঠে, 'খবর্দার, আমার পেটে হাত দেবে না। তিনতিরিক্কে আট। নয় হতে পারে না।'

'নাঃ, সাধে কি আর ভাস্করের মাথা খারাপ হয়ে গেছে? আচ্ছা, আচ্ছা। ওখানে না হয় হাত নাই দিলাম। কিন্তু তোমাকে শিখতেই হবে—তিনতিরিক্কে নয়।'

'অসম্ভব। ভুল শেখা আমার দ্বারা হবে না। তিনতিরিক্কে আট-আট-আট।'

'শাটাপ।' ধমকে ওঠে অভীক, তিনতিরিক্কে আট হয় কি করে? ব্যাখ্যা করে বল তো হাঁদারাম?'

ঘোঁৎ করে রোবট চেঁচিয়ে ওঠে, 'অনেকক্ষণ আমাকে অপমান করে যাচ্ছ, হজম করে যাচ্ছি। আর নয়—হ্যাঁ, ব্যাখ্যা চাইছিলে? শোন। তিন একে তিন মানে তিন × এক, তিন × দুই, এরকম চারে পাঁচে ছ সাতে আটে ন, সবগুলিতেই শব্দ দেওয়া আছে ঠিকঠাক। কিন্তু তিন তিরিক্কে? তিন + তিরি + ইক্কে। তিন হল তিন, তিরি ইংরেজী থ্রী। এক্কে যদি এক হয় তবে ইক্কে হল দুই। অর্থাৎ তিন + তিরি + দুই = আট।'

এই ব্যাখ্যা শুনে অভীকের মুখ চার সেকেণ্ড হা হয়ে থাকে। রোবট আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বলে, 'বুঝলে তো, আমার কোন গণ্ডগোল নেই। এবার আর কি পরীক্ষা করবে বল। যদি ছড়া, গান, কবিতা শুনতে চাও শুনিয়ে দিচ্ছি। যদি ছবি আঁকতে বল—তা-ও করে দেখাচ্ছি। একেবারে অ্যাবস্ট্রাকট্ আর্ট।'

'রক্ষে কর বাপু।' হাত জোড় করে অভীক বলে, 'যথেষ্ট হয়েছে। তোমাকে নিয়ে ভাস্কর পাগল হয়ে গেছে — আমার বাকি নেই।'

'আমি তা হলে চলি।'

'চলি মানে? যাবে কোথায়?'

'ভাস্করের কাছেই যাব।'

'মোটেই না। যদ্দিনে না তুমি তিনতিরিক্কে নয় শিখবে তদ্দিনে তোমার ছাড়ান নেই।'

'বলেইছি তো—তিনতিরিক্কে আট। আবার কেন ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করছ?'

অভীকের এবার প্রচণ্ড রাগ হয়ে যায়। রোবটের পেটে একটা ঘুঁসি চালিয়ে দেয় সে। কোঁৎ করে উঠে অভীককে দু'হাতে তুলে তার কাঁধের উপর বসিয়ে নেয় রোবট। তারপর চলতে শুরু করে। ওর চলার ঝম ঝম শব্দে ঘর কাঁপতে থাকে। অভীকের বুকের ভিতরটাও ধুক ধুক করে ওঠে। দরজা পেরিয়ে রাস্তা দিয়ে চলতে থাকে রোবট। এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে রাস্তার লোকজন পালাতে থাকে। গাড়ি-টাড়ি সব আতংকে উল্টোপাল্টা চলতে থাকায় রাস্তায় বিরাট জ্যামের সৃষ্টি হয়। দুটো লরি, আর একটা দোতালা বাস টপকে রোবট চলতেই থাকে। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে অভীক রোবটের ঘাড়ে বসে থাকে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সামলাবার জন্যে দু'হাতে অ্যান্টেনা-গুলি ধরে পতন সামলায়।

এবার রোবট মনের আনন্দে চিৎকার করে গান ধরে:

তিনতিরিক্কে আট
রামগরুড়ের হাট
শুকনো মেঘের চাট
কেওড়াতলার খাট,
ওহো তিনতিরিক্কে আট,

হা হা তিনাতিরিক্কে আট,
লা—লা—লা—লা—লা।

রোবটের বিকট বেসুরো গানে শহরের সব পাখী আর জীবজন্তু নিমেষে হাওয়া হয়ে গেল। দরজা বন্ধ করে সবাই ইষ্টনাম জপ করতে লাগল ঘরে ঘরে। একটা ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি আসছিল ঘণ্টা বাজিয়ে। এই সাংঘাতিক দৃশ্য দেখে ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে চম্পট দিল। কাঁধের ওপর অভীক ভয়ে কাঠ হয়ে আছে। রোবটটা ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে! ঈস্, বাহাদুরি করে ভাস্বরের কাছ থেকে ওটা সারাবার জন্যে না নিয়ে এলেই হত। কান্না আসছিল অভীকের।

এমন সময় নিচে দু'জনকে দেখে আশার আলো দেখতে পায় অভীক। একটা থামের আড়ালে ভাস্বর আর সুবর্ণগোলক স্যার এদিকে দেখছে। ভাস্বর তা হলে বুদ্ধি করে স্যারকে নিয়ে এসেছে। স্যার যদি কোন উপায়ে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন।

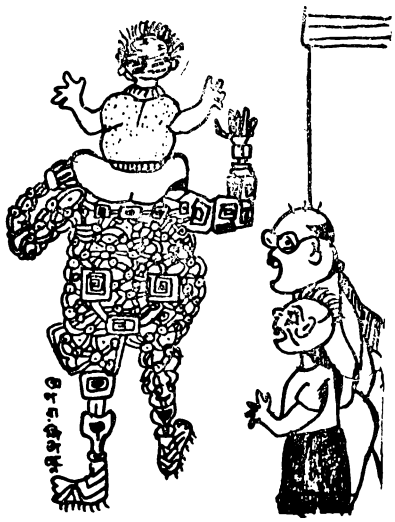

একটা থামের আড়ালে

তাই হলো। অভীক দেখল স্যারের বিখ্যাত আবিষ্কার ইলেকট্রনিক্স ভোমরা মৃদু বোঁ বোঁ শব্দ করে উড়তে উড়তে অভীকের পাশে ঘুরতে লাগল। রোবট মনের আনন্দে হেঁড়ে গলায় গান গেয়ে চলেছে। এদিকে তার খেয়াল নেই। অভীক লক্ষ্য করে দেখল ভোমরার পাখায় এক-টুকরো কাগজ। কাগজটা তুলে নিতে ভোমরাটা চলে গেল। কাগজ খুলে দেখল তাতে লেখা আছে ঃ 'রোবটের মাথার কাছে যে তিনটে লাল সুইচ আছে, তাতে তিনবার চাপ দিলে ওটা বিকল হয়ে যাবে। তারপরেই লাফিয়ে পড়বে কিন্তু।'

এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এলো অভীকের। লাল সুইচ্ তিনবার টিপতেই একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে রোবটা-টা নিশ্চল হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে নিচে লাফিয়ে পড়ল অভীক। রোবটটা কয়েকটা ঝাঁকুনি দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে পিচের রাস্তায় ধড়াম করে আছড়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কিন্তু তখনো ভিতরের গানের যন্ত্র চালু ছিল। গোঙানির মতো শব্দ করে তখনো সে গান গেয়ে চলেছে ঃ তিনাতিরিক্কে আট, রামগরুড়ের হাট, শুকনো মেঘের চাট, কেওড়াতলার খাট.....। সুবর্ণগোলক স্যার একটা হাতুড়ির ঘা দিয়ে গানের যন্ত্রটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'খুব জোর বেঁচে গেছ অভীক। ভাগ্যিস ভাস্বর আমাকে খবর দিয়েছিল।'

ততক্ষণে বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠেছে অভীক। বললো, 'কিন্তু স্যার ওটা এরকম গণ্ডগোল করল কেন?'

'আর বলো না। দু'টো নক্সা করেছিলাম। একটা রোবট হবে গানে, সাহিত্যে শিল্পে মাস্টার, আর একটা বিজ্ঞানের। নক্সা দু'টো ভাস্বরের হাতে দিয়ে বলেছিলাম যে একটা যেন তোমাকে দেয়, আর একটা ও বানাবে। কিন্তু ভাস্বর তোমারটা তোমাকে না দিয়ে দুটো নক্সা মিলিয়ে একটা রোবট বানাতেই যত গণ্ডগোল।'

ব্যাপারটা এবার অভীকের কাছে পরিষ্কার হয়। কট্‌মট করে ভাস্বরের দিকে তাকাতে সে দেখতে পায় লাজুক লাজুক ভঙ্গিতে ভাস্বর স্যারের পিছনে লুকিয়ে। ঘুঁসি পাকিয়ে অভীক এগিয়ে যেতে সুবর্ণগোলফ স্যার বাধা দিয়ে বললেন, 'এখন ঝগড়া নয়। শহরে প্যানিক সৃষ্টি করবার অপরাধে পুলিশ এখুনি আমাদের গ্রেপ্তার করতে আসছে। অবশ্য ভয়ের কিছু নেই। পুলিশের কর্তা আমার মামার শালা। বুঝিয়ে বললেই হবে। কিন্তু ঝামেলা হবার আগেই কেটে পড়া ভাল।'

'কিন্তু স্যার এতগুলি দামী যন্ত্রপাতি রাস্তায় পড়ে থাকবে?'

'ওতে আর আছে কি! আবার আমাকে মাথা খাটিয়ে নতুন নক্সা করতে হবে। আর ঐ যন্ত্রপাতিগুলি বাচ্চারা কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। ও দিয়ে ওরা খেলনা বানাবে। চল এবার কেটে পড়ি। পুলিশের গাড়ি আসছে।'*

* গল্পটিতে স্তানিসোয়াভ লেম-এর একটি গল্পের সামান্য ছায়া আছে।

হাটথুবা, হাবড়া, 24 পরগনা

পদার্থবিদ্যার প্রশ্নোত্তর

অলক চক্রবর্তী

প্রশ্ন 20 ঃ শীতের দেশে গরম জলের পাইপ ঠাণ্ডা জলের পাইপের চেয়ে বেশি ফাটে কেন?

উত্তর 20 ঃ জল জমে বরফ হলে ওর আয়তন বাড়ে (11 ml. জল জমলে 12 ml. আয়তনের বরফ পাওয়া যায়)। শীতের দেশে বেশি ঠাণ্ডায় অনেক সময় পাইপের জল জমে যায়। জল জমে জলের আয়তন বাড়ে বলে তাতে প্রচণ্ড বলের সৃষ্টি হয়, এতেই পাইপ ফেটে যায়। দেখা যায়, ঠাণ্ডা জলের পাইপের চেয়ে গরম জলের পাইপ বেশি ফাটে। গরম জলে ঠাণ্ডা জলের চেয়ে দ্রবীভূত বাতাসের পরিমাণ কম থাকে। ঠাণ্ডা জল জমে বরফ হলে তাতে দ্রবীভূত বাতাস বেরিয়ে যায় এবং বরফের বেড়ে যাওয়া আয়তন এই জায়গা অধিকার করে বলে পাইপে চাপ প্রায়ই পড়েই না। কিন্তু গরম জলের বেলায় এত বাতাস দ্রবীভূত থাকে না বলে এরকম হয় না। ফলে গরম জলের পাইপে প্রচণ্ড চাপ পড়ায় ফেটে যায়।

প্রশ্ন 21 ঃ তাপ প্রয়োগ না করে কিভাবে ঘরের উষ্ণতায় জল ফোটানো সম্ভব?

উত্তর 21 ঃ চাপ কমালে তরলের স্ফুটনাঙ্ক কমে যায়। সুতরাং বদ্ধ পাত্রে জল নিয়ে জলের ওপর চাপ কমাতে থাকলে ওর স্ফুটনাঙ্ক কমতে থাকে। এক সময় যখন ওর স্ফুটনাঙ্ক ঘরের উষ্ণতার সমান হবে তখন ঐ জল তাপ দেওয়া ছাড়াই ঘরের উষ্ণতায় ফুটবে।

প্রশ্ন 22 ঃ এক টুকরো বরফের মধ্যে একটু গর্ত করে তাতে জল ঢাললে ঐ জল জমে বরফ হবে কি? কেন?

উত্তর 22 ঃ বরফ টুকরোটার মধ্যে একটু গর্ত করে জল রাখলে ঐ জল থেকে তাপ নিয়ে বরফ একটু একটু করে গলতে থাকবে যতক্ষণ না জল ও বরফের উষ্ণতা সমান হয় (মোটামুটি O°C)। এই অবস্থাতে জল জমবার জন্যে যে লীন তাপের দরকার তা জল থেকে বের করা সম্ভব নয়। কারণ বরফ এবং জলের উষ্ণতা তখন সমান। সুতরাং ঐ গর্তে থাকা জল কখনই বরফ হবে না।

প্রশ্ন 23 ঃ ঘামে ভেজা দেহ পাখার হাওয়ায় ঠাণ্ডা হয় কেন?

উত্তর 23 ঃ পাখার হাওয়ায় ঘামে ভেজা দেহের ঘাম বাষ্পীভূত হয় এবং বাষ্পীভবনের লীন তাপ দেহ থেকেই পাওয়া যায়। তাই দেহ তখন ঠাণ্ডা হয়।

প্রশ্ন 24 ঃ O°C উষ্ণতার জল অপেক্ষা O°C উষ্ণতার বরফ অনেক বেশি ঠাণ্ডা বলে মনে হয় কেন?

উত্তর 24 ঃ O°C উষ্ণতার বরফ প্রতি গ্রামে 80 ক্যালরি তাপ নিয়ে O°C উষ্ণতার জলে পরিণত হয়। সুতরাং O°C উষ্ণতার একই ভরের জল ও বরফ হাতে নিলে বরফ হাত থেকে বেশি পরিমাণ তাপ শোষণ করবে বলে ওটা বেশি ঠাণ্ডা বলে মনে হয়।

প্রশ্ন 25 ঃ পদার্থ কখন লীনতাপ নেয় বা ছাড়ে?

উত্তর 25 ঃ একটা অবস্থা থেকে যখন অন্য আর একটা অবস্থায় যায়, তখন পদার্থ লীন তাপ নেয় বা ছাড়ে। পদার্থ কঠিন থেকে তরল বা তরল থেকে বাষ্পে পরিণত হবার সময় লীন তাপ নেয় এবং বাষ্প থেকে তরলে বা তরল থেকে কঠিন হবার সময় পদার্থ লীন তাপ ছাড়ে।

প্রশ্ন 26 ঃ বাষ্পায়নের ফলে ঠাণ্ডা হয় কেন?

উত্তর 26 ঃ তরলের বাষ্পায়নের জন্যে কিছুটা বাষ্পীভবনের লীন তাপের দরকার হয়। বাইরে থেকে এই তাপ দেওয়া না হলে, তরল নিজের দেহ থেকে বা চারদিক থেকে ঐ লীন তাপ নিয়ে আস্তে আস্তে বাষ্পে পরিণত হতে থাকে। এজন্যেই বাষ্পায়নের ফলে তরল ও তার চারপাশ ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে এবং শৈত্যের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন 27 ঃ বরফের সঙ্গে নুন মেশালে হিমমিশ্রণের উষ্ণতা O°C-র চেয়ে কম হয় কেন?

উত্তর 27 ঃ বরফের সঙ্গে নুন মেশালে কিছুটা নুন তাতে মিশে যায় এবং মিশে যাবার সময় দ্রবণ তৈরীর জন্যে বরফ থেকে তাপ নেয়। ফলে বরফের তথা হিমমিশ্রণের উষ্ণতা O°C-র চেয়ে কমে যায়। তিন ভাগ বরফের সঙ্গে এক ভাগ নুন মিশিয়ে তৈরী হিমমিশ্রণের উষ্ণতা হয়—20°C

প্রশ্ন 28 ঃ পাহাড়ের ওপর খোলা পাত্রে জল ফুটিয়ে খাবার ভাল সেদ্ধ করা যায় না কেন?

উত্তর 28 ঃ প্রমাণ চাপে ভাল জল 100°C উষ্ণতাতে ফোটে। পাহাড়ের ওপর বায়ুচাপ ঐ চাপের চেয়ে কম। চাপ কমালে তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক কমে যায় অর্থাৎ পাহাড়ের ওপর খোলা পাত্রের জল 100°C-র কম উষ্ণতাতেই ফোটে। জলের এই উষ্ণতা খাবার জিনিস

(বিশেষভাবে মাংস) ভাল সেদ্ধ হবার পক্ষে যথেষ্ট নয় বলে পাহাড়ের উপর খোলা পাত্রে জল ফুটিয়ে খাবার ভাল সেদ্ধ করা যায় না।

প্রশ্ন 29 ঃ বরফ, ন্যাপথালিন বা মোমের ওপর চাপ বাড়ালে ওদের গলনাঙ্কের কিরকম পরিবর্তন ঘটবে ?

উত্তর 29 ঃ বরফের গলনে আয়তন কমে যায়, তাই ওর ওপর চাপ বাড়ালে গলনাঙ্ক কমে যাবে। বরফের ওপর 1 বায়ুমণ্ডলের চাপের বদলে 133 বায়ুমণ্ডলের চাপ দিলে ওর গলনাঙ্ক 0°C-র বদলে—1°C হবে।

ন্যাপথালিন বা মোমের গলনের ফলে আয়তন বেড়ে যায়, তাই ওদের ওপর চাপ দিলে গলনাঙ্ক বেড়ে যাবে।

প্রশ্ন 30 ঃ তাড়াতাড়ি বাষ্পীভবনে তরল ঠাণ্ডা হয় কেন ?

উত্তর 30 ঃ বাষ্পীভবনের জন্যে লীনতাপের দরকার হয়। আস্তে আস্তে বাষ্পীভবন হলে তরল তার কাছাকাছি থাকা অন্য বস্তু থেকে তাপ নিয়েই দরকারী লীনতাপ জোগাড় করে। বাষ্পীভবন তাড়াতাড়ি হলে দরকারী লীনতাপ অন্য জায়গা থেকে নিয়ে ওঠার সুযোগ পায় না বলে তরল নিজের বাকি অংশ থেকেই লীনতাপ জোগাড় করে, ফলে ঠাণ্ডা হয়।

প্রশ্ন 31 ঃ খোলা বাতাসে শুকনো গ্লাসে বরফ রাখলে গ্লাসের বাইরে কিছু কিছু জল জমতে দেখা যায় কেন ?

উত্তর 31 ঃ বাতাসে সব সময়েই কিছু না কিছু জলীয় বাষ্প থাকে। শুকনো গ্লাসের মধ্যে বরফ রাখলে গ্লাসের উষ্ণতা কমে যায়, ওর কাছাকাছি থাকায়। ফলে গ্লাসের কাছাকাছি বা গ্লাসে লেগে থাকা বাতাসের জলীয় বাষ্প এক সঙ্গে হয়ে বিন্দু বিন্দু জলের কণা হয়ে গ্লাসের বাইরের গায়ে জমা হয়।

প্রশ্ন 32 ঃ বাষ্পায়নের সময় লীন তাপের দরকার হয় কি ?

উত্তর 32 ঃ হ্যাঁ, বাষ্পায়ন ইত্যাদি যে কোন রকম বাষ্পীভবনের সময়েই লীন তাপের দরকার হয়। তরল যে উষ্ণতাতেই বাষ্পীভূত হোক না কেন সব সময়েই ওর এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থার জন্যে লীন তাপের দরকার। উষ্ণতা কম হলে বাষ্পীভবনের জন্যে বেশি লীনতাপের দরকার হয়।

প্রশ্ন 33 ঃ লীন তাপ কোথায় যায় ? গলনের লীন তাপের চেয়ে বাষ্পীভবনের লীনতাপ বেশি হয় কেন ?

উত্তর 33 ঃ পদার্থের তিনটি ভৌত অবস্থায় তার ভিতরের অণুর ব্যবধানের মান আলাদা। কঠিনের বেলায় এই ব্যবধান সবচেয়ে কম, তারপর তরলের, আর গ্যাসের বেলায় এই ব্যবধান সবচেয়ে বেশি। আর অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বল কঠিনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি, তারপর তরলের, আর গ্যাসের এই বল খুব কম। পদার্থের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাবার সময় যে তাপশক্তি দেওয়া হয়, তা ঐ আকর্ষণ বলের বিপক্ষে কাজ করে। অণুর পরস্পরের ব্যবধান বেড়ে যায় (এবং বেরিয়ে যাওয়া তাপ-শক্তি ব্যবধান কমায়)। বাইরে থেকে দেওয়া লীনতাপ ঐ কাজে সাহায্য করে বলে ওর বাইরের প্রকাশ ঘটে না (অর্থাৎ উষ্ণতার কোন পরিবর্তন হয় না তখন)।

কোন পদার্থকে কঠিন থেকে তরল অবস্থায় পরিণত করতে অণুগুলোর মধ্যে ব্যবধান যে পরিমাণে বাড়াতে হয় তরল থেকে বায়বীয় অবস্থায় নিতে ঐ ব্যবধান তার চেয়ে অনেক বেশি বাড়াতে হয়। এই কারণে বাষ্পীভবনের ক্ষেত্রে গলনের চেয়ে বেশি পরিমাণে কাজ করতে হয় বলে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ তাপশক্তির দরকার হয়। এজন্যে গলনের লীনতাপের চেয়ে বাষ্পীভবনের লীনতাপ অনেক বেশি হয়।

যেমন, বরফ গলনের লীনতাপ প্রতি গ্রামে 80 ক্যালরি, কিন্তু জলের বাষ্পীভবনের লীনতাপ প্রতি গ্রামে 537 ক্যালরি।

প্রশ্ন 34 ঃ 0°C-র চেয়ে কম বা বেশি উষ্ণতায় বরফকে কি করে গলানো যাবে ?

উত্তর 34 ঃ বরফের ওপর চাপ দিলে, ওর গলনাঙ্ক কমে যায়। চাপ কমালে গলনাঙ্ক বেড়ে যায়। কাজেই চাপ বাড়িয়ে বরফকে 0°C-র চেয়ে কম উষ্ণতায় এবং চাপ কমিয়ে 0°C-র বেশি উষ্ণতায় গলানো যায়।

প্রশ্ন 35 ঃ অপরিবর্তিত চাপে পদার্থের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক কি একই ?

উত্তর 35 ঃ বরফ, ঢালাই লোহা, অ্যান্টিমনি, বিসমাথ প্রভৃতি সব নিয়তাকার (কেলাসিত) পদার্থের একই বাতাসের চাপে গলনাঙ্ক এবং হিমাঙ্ক এক। যেমন, প্রমাণ বায়ু চাপে (76 cm পারদ স্তম্ভের চাপে) বরফের গলনাঙ্ক 0°C, জলের হিমাঙ্কও 0°C। লোহার গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক প্রমাণ বায়ুচাপে 1200°C.

মোম, কাচ, চর্বি, মাখন প্রভৃতি অনিয়তাকার পদার্থের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক (যখন চাপ স্থির) আলাদা হয়। যেমন, মাখন 28°C থেকে 33°C উষ্ণতার মধ্যে গলে, কিন্তু 20°C থেকে 23°C উষ্ণতার মধ্যে জমে।

প্রশ্ন 36 ঃ জলের স্ফুটনাঙ্ক নির্ণয় করবার সময় থার্মোমিটারের কুণ্ডটি জলের ভেতরে না ডুবিয়ে ওর ওপরে রাখা হয় কেন?

উত্তর 36 ঃ জলে কোনো জিনিস মিশ্রিত থাকলে জলের স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যায়। কিন্তু স্টীমের উষ্ণতা স্ফুটনের সময়ে কাজকরা বাতাসের চাপে ভাল জলে যে স্ফুটনাঙ্ক হবার দরকার তার সমান থাকে। তাই থার্মোমিটারের কুণ্ড জলের মধ্যে রাখলে যে স্ফুটনাঙ্ক পাওয়া যায়, তা ঠিক নাও হতে পারে। কিন্তু স্টীমের ভেতর থার্মোমিটার কুণ্ড রাখলে ঠিক স্ফুটনাঙ্ক পাওয়া যায়। এজন্যে জলের স্ফুটনাঙ্ক মাপার সময় থার্মোমিটারের কুণ্ডটি জলের ভেতরে না ডুবিয়ে ওর ওপরে রাখা হয়।

প্রশ্ন 37 ঃ হিমায়ন (বা কঠিনীভবন) ও গলনের সময়ে লীনতাপের কাজ কি?

উত্তর 37 ঃ গলনের সময়ে প্রতি গ্রাম কঠিন যে-পরিমাণ লীন-তাপ নিয়ে তরলে পরিণত হয়, হিমায়নের সময়ে ঐ তরলের প্রতি গ্রাম ঠিক ঐ পরিমাণ লীন-তাপ ছেড়ে দিয়ে কঠিন হয়। গলনের সময়ে কঠিনের উষ্ণতা গলনাঙ্কে ঠিক থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সব লীনতাপ নিয়ে নেয়। আবার, হিমায়নের সময়ে তরলের উষ্ণতা ওর হিমাঙ্কে ঠিক থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ওটা সমস্ত লীনতাপ ছেড়ে দেয়।

প্রশ্ন 38 ঃ দুপুরে ও সন্ধ্যেয় কখনও শিশির দেখা যায় না কেন?

উত্তর 38 ঃ দুপুরে বায়ুর উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় বাতাসের জলীয় বাষ্প ধরার ক্ষমতা বেড়ে যায়। ঐ উষ্ণতা শিশিরাঙ্কের চেয়ে বেশি হবার জন্যে শিশির দেখা যায় না। আবার ভোরের শিশিরও বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুতে মিশে যায়।

সন্ধ্যেবেলা বায়ুর উষ্ণতা কমে গেলেও শিশিরাঙ্কে পৌঁছায় না। ফলে সন্ধ্যেবেলায় শিশির জমে না, শিশিরও দেখা যায় না।

প্রশ্ন 39 ঃ রাত্রিবেলাতে গাছের পাতায় চেয়ে ঘাসের ডগায় শিশির বেশি জমে কেন?

উত্তর 39 ঃ রাত্রিবেলাতে পৃথিবী তাপ ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হতে থাকে ও ঠাণ্ডা বাতাস নিচের দিকে নেমে আসে। ফলে পৃথিবীর মাটির কাছাকাছি ঘাস প্রভৃতি বস্তুগুলো ঠাণ্ডা হয় এবং তাতে শিশির জমে। গাছের পাতা ভূপৃষ্ঠ থেকে বেশি দূরে থাকায় ওটার থেকে ঘাসের চার-পাশের বাতাস অনেক বেশি ঠাণ্ডা হয়। তাই গাছের পাতায় বেশি শিশির জমতে পারে না। এজন্যেই রাত্রিবেলাতে গাছের পাতার চেয়ে ঘাসের ডগায় বেশি শিশির জমে।

প্রশ্ন 40 ঃ মেঘমুক্ত আকাশ মেঘে-ঢাকা আকাশের চেয়ে শিশির জমবার পক্ষে বেশি উপযোগী কেন?

উত্তর 40 ঃ তাপবিকিরণে ভূপৃষ্ঠ ঠাণ্ডা হয়। বায়ু-মণ্ডলের উষ্ণতা কমে যাওয়ায় তাতে থাকা জলীয় বাষ্প ঘনীভবনের ফলে শিশিরে পরিণত হয়। আকাশ মেঘ-মুক্ত থাকলে ঐ তাপ তাড়াতাড়ি ভূপৃষ্ঠ থেকে ছেড়ে যায় বলে বায়ুমণ্ডল তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে ঐ বিকীর্ণ তাপ মেঘে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে বলে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা কমে যায় না। এজন্যে ঐ অবস্থাতেই শিশির কম জমে। আকাশ মেঘ-মুক্ত থাকলে শিশির বেশি জমার এটাই কারণ।

প্রশ্ন 41 ঃ কি কি কারণে বেশি শিশির জমতে সুবিধে হয়?

উত্তর 41 ঃ (i) মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ,

(ii) কম বায়ুচলাচল,

(iii) বায়ুমণ্ডলে বেশি জলীয় বাষ্প থাকতে হবে,

(iv) তাপের ভাল বিকিরক কিন্তু কুপরিবাহী বস্তুর সান্নিধ্য।

প্রশ্ন 42 ঃ গ্যাস ও বাষ্প কাকে বলে? ওদের মধ্যে তফাৎ কি?

উত্তর 42 ঃ বাষ্প পদার্থের এমন এক বায়বীয় অবস্থা যাকে শুধু চাপ দিলে তরলে পরিণত করা যায়। কিন্তু গ্যাস হলো পদার্থের এমন এক বায়বীয় অবস্থা যাকে তরলে পরিণত করতে চাপ বাড়ানোর সঙ্গে উষ্ণতাও কমাতে হয়।

সুতরাং গ্যাস ও বাষ্প এক নয়। আসলে, সঙ্কট উষ্ণতার নিচে সব গ্যাসই বাষ্প ও সংকট উষ্ণতার ওপরে সকল বাষ্পই গ্যাস। অ্যামোনিয়ার (NH_3) সংকট উষ্ণতা 139°C; NH_3-র উষ্ণতা ওর বেশি হলে ওকে গ্যাস এবং কমলে বাষ্প বলা হয়।

জয়পুরিয়া কলেজ, কলকাতা-5

সঞ্চয়িকা সঞ্চয় পরিকল্পনা

সঞ্চয়িকা বিদ্যালয় সঞ্চয় ব্যাঙ্ক

সঞ্চয় কৌশল ও আর্থিক লেনদেন বিষয় শিক্ষার জন্য
ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী

ইতিমধ্যেই 950টি বিদ্যালয়ে 2 লক্ষের বেশি ছেলেমেয়ে এই পরিকল্পনায় নাম তালিকাভুক্ত করেছে—তোমাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে জাতীয় ভিত্তিক স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিদ্যালয়গুলি 'সঞ্চয়িকা দিবস' পালনের জন্য আজই নাম অন্তর্ভুক্ত করুন।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন।

জেলা সঞ্চয় অফিসার
জেলাগুলিতে এবং প্রধান প্রধান মহকুমায়
আঞ্চলিক আধিকারিক

জাতীয় সঞ্চয় (ভারত সরকার)
হিন্দুস্থান বিলডিংস
কলিকাতা—700072 এবং বর্দ্ধমান

সহজে যোগ

সিদ্ধার্থ রায়

সহজে যোগ শেখার কথায় তোমরা নিশ্চয়ই অভিমান করতে পার। কারণ যোগটাই সবচেয়ে সহজ অঙ্ক! গুণতে শেখার পরই আমরা যোগ করতে শিখি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমরা যেভাবে যোগ করি, তাতে একটা বড়সড় যোগ অঙ্কই বেশ বেগ দিতে পারে। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক ঃ

```
79078
56789
88398
59977
83356
98868
─────
```

এক্ষেত্রে যোগ করার প্রণালীটা শক্ত নয়, কিন্তু যোগ করার সময় একটা পাটী (column) ধরে মনে মনে যোগ করাটা সময় সময় বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়ায় এবং ভুলও হয়। উপরের উদাহরণে শুধু ছটা পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা ধরা হয়েছে, -আরো বেশি এবং বড় সংখ্যা হলে ব্যাপারটা শক্ত হয়েই দাঁড়ায়।

এবার দেখা যাক্ সহজে যোগটা কিভাবে করা যাবে। এই প্রণালীতে ডান দিকের পাটী ধরে যোগ করতে হবে তার কোন মানে নেই। যে কোন একটা পাটী দিয়ে শুরু করা যায়। আমরা সবচেয়ে বাঁদিকের পাটী নিয়ে শুরু করব।

প্রণালীটার প্রথম নিয়ম হলো কোন পাটীর সংখ্যাগুলো যোগ করতে করতে যেই তা দশ বা তার বেশি হবে, অমনি সেই যোগফলের থেকে 10 বাদ দিয়ে বিয়োগ ফল থেকে ফের যোগ করা শুরু করতে হবে। এইভাবে পাটীর সব সংখ্যা শেষ হলে যোগফল ঐ পাটীর নিচে লিখতে হবে। এটাকে বলা হবে 'হ্রস্ব-যোগফল'।

দ্বিতীয় নিয়মটা হলো প্রত্যেক পাটীর হ্রস্ব যোগফল বার করবার সময় কতগুলো 10 বাদ দেওয়া হয়েছে সেই সংখ্যাটাকে বের করে, ঐ পাটীর থেকে এক ঘর বাঁ দিকে হ্রস্ব যোগফলের নিচে লেখা। মনে রাখবার সুবিধার জন্যে যে সংখ্যাতে এসে যোগফল 10 বা তার বেশি হবে সেই সংখ্যাটার গায়ে একটা টিক্ চিহ্ন দিয়ে দাও। একটা পাটীতে কতগুলো টিক্ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে গুণে নিলেই টিক্ সংখ্যা পাওয়া যাবে।

এবার হ্রস্ব যোগফল আর টিক্ সংখ্যার মধ্যে আমাদের মতন করে যোগ করলে যে যোগফল পাবো তাই আমাদের মূল অঙ্কের যোগফল।

এবার দেখা যাক অঙ্কটা আমাদের নিয়মে কষলে কেমন দাঁড়ায় ঃ

```
     7   9   0   7   8
     5′  6′  7   8′  9′
     8′  8′  3′  9′  8′
     5   9′  9   7′  7′
     8′  3   3′  5   6
     9′  8′  8′  6′  8′
   ─────────────────────
     2   3   0   2   6
 4   4   3   4   4
 ───────────────────────
 4   6   6   4   6   6
```

সর্ববামের পাটীর সংখ্যাগুলো নিলে প্রথমেই আমরা 7 এবং 5 এর মধ্যে যোগ করে পাই 12, তার থেকে 10 বিয়োগ করলে থাকে 2, 5 এর গায়ে প্রথম টিক্ চিহ্ন দেওয়া হলো। এরপর 2 এর সঙ্গে 8 যোগ করলে হয় 10। সুতরাং 8 এর গায়ে ফের টিক্ চিহ্ন আর 10 এর থেকে 10 বাদ দিয়ে শূন্য দিয়ে ফের শুরু। 0 এর সঙ্গে এরপর 5 যোগ করব, তার সঙ্গে আবার 8। যোগফল 13, তার থেকে ফের 10 বিয়োগ, হতে রইল 3। 8 এর গায়ে টিক চিহ্ন দিতে হলো আর 3এর সঙ্গে যোগ করা হলো পাটীর শেষ সংখ্যা 9। যোগফল 12। 10 বাদ দিয়ে 2 পাওয়া গেল যা হ্রস্ব যোগফল হিসাবে প্রথম পাটীর নিচে লেখা হয়েছে। পাটীতে টিক্ চিহ্ন পড়েছে 4টা, তাই এই পাটী থেকে এক ঘর বাঁদিকে টিক্ সংখ্যার লাইনে লেখা হয়েছে 4। এইভাবে পর পর সবগুলো পাটীর জন্যেই হ্রস্ব যোগফল আর টিক্ সংখ্যা কষা হয়েছে।

এবার দুটো লাইনের মধ্যে যোগ করে আমাদের মূল অঙ্কের যোগফল পাওয়া গেছে।

এবার দেখা যাক এই প্রণালীটা আমাদের চলতি পদ্ধতি থেকে সহজ হবে কেন। এ ক্ষেত্রে কখনই 18এর চেয়ে বেশি সংখ্যা মনে মনে যোগ করতে হচ্ছে না। কতবার 10 বাদ দিলাম সেটা মনে রাখবার জন্যেও কষ্ট করতে হচ্ছে না।

আমাদের নতুন নিয়মে কষা যোগফলটা ঠিক হয়েছে কিনা চলতি নিয়মে একবার কষে দেখে নিও। নতুন নিয়মটা রপ্ত করার জন্যে আরো কয়েকটা বড় বড় অঙ্ক কষে দেখো। অসুবিধা হবে না আশা করি।

37/2, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ), কলিকাতা-31

ধূমকেতুর বৃত্তান্ত

সুজয় চক্রবর্তী

ধূমকেতুকে নিয়ে চিন্তার কোনো শেষ নেই। শেষ নেই ভাবনারও। সুখের কথা 'ধূমকেতু' নামটার সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে ধ্বংসের চিত্র প্রত্যক্ষ করতেন, মানুষের মন থেকে সেই ভিত্তিহীন ধারণার বরফ খানিকটা গলানো গেছে। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, রাতের তারা-ভরা আকাশের মতো তাই ধূমকেতু'-ও আমাদের কাছে সুন্দর দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ধূমকেতুকে দেখতে কেমন? খালি চোখে আমরা তাকে দেখি একটা লেজবিশিষ্ট নক্ষত্রের মতো। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইলেন। তাই বহুগুণ শক্তিশালী টেলিস্কোপে চোখ রাখলেন তাঁরা। দেখলেন ধূমকেতুকে বহুগুণ স্পষ্ট করে। দেখলেন ধূমকেতুর একটা অংশ খুব ঘন। যেন একটা স্বপ্রভ আলোর উৎস সেটা (যদিও ধূমকেতু প্রকৃতই স্বপ্রভ আলোর উৎস)। তাঁরা ঐ অংশটির নাম দিলেন 'নিউক্লিয়াস'। শুধু তাই নয় তাঁরা আরও দেখলেন যে, ঐ 'নিউক্লিয়াস' অংশটিকে ঘিরে একটা পাতলা স্তর হয়েছে—তাঁরা ঐ অংশটির নাম দিলেন 'কোমা'। 'নিউক্লিয়াস' এবং 'কোমা' এই দুটি অংশকে মিলিতভাবে বলা হয় ধূমকেতুর মস্তক ভাগ। ধূমকেতুর শুধু একটি মাথাই থাকে না, একটি লেজও থাকে। তবে লেজের সংখ্যার তারতম্য হতে পারে। এক না হয়ে একাধিকে পৌঁছতে পারে সেই সংখ্যা। একটা উদাহরণ দিই। 1744 খ্রীষ্টাব্দে দেখা পাওয়া অত্যুজ্জ্বল ধূমকেতুটির লেজ কিন্তু একটি বা দুটি নয়, ছিল ছটি। সব চাইতে আশ্চর্য লাগে, এই বিশ্বজগতের সব কিছুই যখন পরিবর্তনশীল (এমনকি পৃথিবীর কমলালেবুর মতো আকারও যখন পরিবর্তিত হয়ে নাসপাতির আকার নিয়েছে), তখন ঐ ধূমকেতুই একমাত্র মহাজাগতিক বস্তু যা অপরিবর্তিত থাকে আকারে ও গঠনে। ধূমকেতুর জন্মস্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন মত থাকলেও বর্তমানের সব চাইতে গ্রহণীয় মতের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে বলতে হয়, এদের জন্ম আমাদের সৌরজগৎ থেকে $2\frac{1}{2}$ 'আলোকবর্ষ' দূরের কোন জায়গা থেকে। অর্থাৎ সহজ ভাষায় বললে দাঁড়ায়, সেকেণ্ডে আলো 1,86000 মাইল বেগ নিয়ে পরিভ্রমণ করলে $2\frac{1}{2}$ বছরে সে যতখানি দূরত্ব অতিক্রম করে ততদূরে এই ধূমকেতুর আঁতুড়ঘর। যদিও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই দূরত্বকে খুব একটা বেশি বলেন না। কারণ আমরা যেমন এক ফুট বোঝাতে বার ইঞ্চি লম্বা একটা কাঠের স্কেলকে বোঝাই, ঠিক তেমনই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 9 কোটী 30 লক্ষ মাইলকে একক হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ মহাবিশ্ব আর পৃথিবীর মধ্যে তুলনাটা পৃথিবী আর এক চিলতে ছোট্ট একটা কণার সঙ্গেই সাথকভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। যে মত গ্রহণ করে আমরা ধূমকেতুর আঁতুড়ঘর নির্ণয় করলাম, তার উদ্গাতা বিজ্ঞানী উরট। এই ডাচ্ বিজ্ঞানী 1750 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর উপরোক্ত মত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে ঐ আঁতুড়ঘরে 10^{11} সংখ্যার ধূমকেতুর জন্ম হয়েছে।

9 কোটী 30 লক্ষ মাইল দূরত্বকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে এক অস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট বলে। আমরা যেমন কারো সঙ্গে পরিচিত হবার পর তার রূপ গুণ খতিয়ে দেখি, ঠিক তেমনই বিজ্ঞানীরা ধূমকেতুর সঙ্গে পরিচিত হবার পরে খোঁজ করতে চেষ্টা করলেন, কোন মালমশলায় এদের দেহ গড়া। শুরু হলো গবেষণা। যখনই ধূমকেতুকে

1911 সালে দৃষ্ট ব্রুকস ধূমকেতু

পৃথিবীর কাছাকাছি আসতে দেখা যায় তখনই বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ধরা পড়েছে এর দেহগঠনকারী মালমশলার প্রকৃতি। দেখা গেছে, ধূমকেতুর মধ্যে রয়েছে বহু ধরনের গ্যাস। এদের নিউক্লিয়াসটা একটা বরফের বল ছাড়া কিছুই নয়। আর সেই বলটার মধ্যেই থাকে সায়ানোজেন (C_2N_2), কার্বন (C), কার্বন মনোক্সাইড (CO), নাইট্রোজেন (N), হাইড্রোক্সিল (OH) এবং নাইট্রোজেন হাইড্রাইড (NH)।

এবার বলি মাথা থেকে ধূমকেতুর কেমনভাবে লেজ তৈরী হয় তার কথা। জন্মস্থান আমাদের সৌরজগতের থেকে অনেক দূরে হলেও সৌরজগতের সর্ববহিঃস্থ কক্ষপথে থাকা গ্রহ প্লুটোর চতুর্দিকে রয়েছে একটা আহিত ক্ষেত্র তারই আকর্ষণে ছুটে এসে সৌরজগতের মধ্যে ঢুকে পড়ে এক বা একাধিক ধূমকেতু। ছুটতে থাকে সৌরজগতের প্রাণকেন্দ্র সূর্যের দিকে। 'বরফের বল' ঐ নিউক্লিয়াস অংশটিই সূর্যের দিকে মুখ করে আসলে ছুটে। আমরা জানি, সূর্যের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগের তাপমাত্রা যথেষ্ট বেশি। এর ঠিক কেন্দ্রের তাপমাত্রা 14,000000°C এবং এর পৃষ্ঠভাগের তাপমাত্রা 6000°C এই তাপমাত্রায় কোন পদার্থেরই কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় এই তিনটি অবস্থার একটিতেও থাকার কথা নয়। এরা থাকে 'আহিত' অবস্থায়। তখন সূর্যের ঐ প্রচণ্ড তাপে পদার্থের পরমাণু থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে ইলেকট্রনগুলো। এই অবস্থার নাম 'প্লাজমা'। আর যতই ইলেকট্রন নির্গত হতে থাকে বেশি পরিমাণে, সূর্যের চারদিকে তড়িৎ ক্ষেত্রের বিস্তৃতিও বাড়তে থাকে সঙ্গে সঙ্গে। আর ঐ তড়িৎক্ষেত্রের ডাকেই সাড়া দিতে দূর থেকে ছুটে আসে ধূমকেতুগুলো। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ঐ নিউক্লিয়াস গড়ে উঠেছে অন্তঃস্থ ছোট ছোট কণা আকৃতিবিশিষ্ট প্রচুর কঠিন পদার্থে। সেই 'নিউক্লিয়াস' বা ধূমকেতুর মাথা যখন তড়িৎক্ষেত্রের ডাকে সাড়া দিতে সূর্যের কাছে এগিয়ে আসে, তখন সূর্যের গনগনে আঁচের আশীর্বাদ বর্ষিত হয় তার মাথার ওপরে। ঐ প্রচণ্ড তাপের উত্তেজনায় নিউক্লিয়াসের পৃষ্ঠতলের বহির্ভাগের কণিকাগুলো কঠিন পদার্থের কঠিন বাঁধন ছিঁড়ে বাষ্পের সৃষ্টি করে আর নিজেরা খেয়ালখুশীমত দুরন্ত বেগে ঘোরাফেরা করে। এই 'কণিকরা অবশ্যই পরমাণু আর ঐ পুতুলনাচের সুতো যার হাতে তারা হলো ইলেকট্রন। এবার সেই গ্যাসীয় পদার্থই বেরিয়ে আসে নিউক্লিয়াসের বাইরে (তার সঙ্গে কিছু ধুলোবালিও থাকে) আর তারপর একটা পাতলা গ্যাসীয় চাদরে ঢেকে দেয় গোটা নিউক্লিয়াসটাকে। আর ঐ চাদরটিকেই বলে 'কোমা।' এরপর সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা বিভিন্ন বিকিরণ (কেউ কেউ বলেন 'সৌরঝড়ই' এর জন্যে দায়ী) ঐ গ্যাসের চাদরে গিয়ে ধাক্কা মারে আর ঐ ধাক্কার ফলেই কিছু কিছু গ্যাসীয় পদার্থ (ধুলোবালি সহ) ছড়িয়ে যায়। আর পরপরই সেই ছড়িয়ে-যাওয়া পদার্থই ধূমকেতুর পিছন দিকে একটা লেজ তৈরী করে দেয়। আর ঐ লেজের খোলা মুখটা কিন্তু সর্বদাই সূর্যের দিকে পিছন করে থাকে। সূর্যের বিকিরণ ঐ গ্যাসীয় কণা, ধুলোবালির ওপর পড়ে ওদেরকে দৃশ্যমান করে তোলে। তবে এরা শুধুমাত্র নিষ্প্রভ নয়, কারণ এরা অতি-বেগুনী রশ্মি শোষণ করে। সেই শোষিত আলোকেই দৃশ্যমান সাধারণ আলোর চেহারায় ফিরিয়ে দেয়। ফলে এদের স্বপ্রভ আলোর উৎসের সম্মান জানাতেও আমাদের আর কুণ্ঠা জানানো উচিত নয়।

আমাদের প্রাণীদের মধ্যে যেমন কারো মাথা লম্বাটে, কারো চ্যাপ্টা, কারো গোল। ঠিক তেমনিই অসংখ্য ধূমকেতুর কারো কারো মাথাটা ছোট, কারো বড়। যেহেতু ধূমকেতুর লেজ তৈরী হয় ওদেরই মাথা থেকে বেরিয়ে আসা বিভিন্ন মালমশলা দিয়ে, তাই যাদের মাথা থেকে বহু মালমশলা বেরিয়ে গিয়ে লেজের সৃষ্টি করে তাদের মাথাটা স্বভাবতই যায় ছোট হয়ে আর বড় হয় লেজ। সূর্য আর ধূমকেতুর মাথাকে একটা সরলরেখায় (কাল্পনিক) যোগ করে তাকে বাড়িয়ে দিলে দেখা যায়, সরলরেখাটি সব সময় লেজের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে মেলে না। কারণ এই লেজটা খানিকটা গরুর শিংয়ের মত বাঁকানো। যত দিন যায়, যত বেশি বার কক্ষপথে আবর্তন করে সূর্যের কাছে আসে ধূমকেতু, তত তার ভাঁড়ারের মালমশলা অর্থাৎ নিউক্লিয়াস দুর্বল হয়ে আসতে থাকে আর সে তার সব উপাদান উজাড় করে দিতে থাকে তার লেজটিকে। ফলে লেজটি মাপে বড় হয় ক্রমশ আর তার ফলেই ধূমকেতু একদিন শেষও হয়ে যায়। তবে কোনও একটি ধূমকেতুর 'গঙ্গাপ্রাপ্তি' হবার ফলে তার লেজটি সর্বাপেক্ষা লম্বাকৃতি হতে পারে। 1861 খ্রীষ্টাব্দে এইরকমই একটা ধূমকেতু আকাশে দেখা গিয়েছিল যার লেজটা আকাশের দুই-তৃতীয়াংশকে ঢেকে দিয়েছিল এবং পৃথিবীর ওপর বেশ বড়রকমের একটা ছায়া ফেলে দিয়েছিল। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, প্রদীপ নেভাবার আগে যেমন দারুন প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে, ঐ ধূমকেতুটির ক্ষেত্রেও ঘটেছিল ঠিক তাই। দুঃখের বিষয় আমাদের সেই ধূমকেতুটিকে দেখা হলো না, কারণ বিজ্ঞানীরা বলে দিয়েছেন ঐ ধূমকেতুটির শেষ হয়ে গেছে। শেষ অবস্থায় ধূমকেতুর

লেজ যেই মুখ দেখায় সূর্যকে অমনি এক ঝাপ্‌টায় সূর্য তার কণিকাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় মহাবিশ্বের বিশাল গহ্বরে। এমনিভাবেই হারিয়ে যায় ধূমকেতু। 1845 সালে বীলার ধূমকেতু যখন সূর্যের কাছে এসেছিল, তখন সূর্যের প্রবল অভিকর্ষীয় টানে তার ওপর পড়েছিল প্রভূত টান। দুদিক থেকে প্রচণ্ড টানে ধূমকেতুটির *'নিউক্লিয়াস' দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল।* পরে তাদের দেখা গিয়েছিল 1852 সালে, তারা তখন একই কক্ষ-পথে পরস্পরের থেকে কিছুটা দূরত্বে অবস্থান করছিল। আশা করা সত্ত্বেও 1859 এবং 966 সালে এদের আর দেখা যায় নি। কেননা তাদের নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে যাওয়ায় তাদের শক্তি গিয়েছিল আরও কমে। বিজ্ঞানী হোয়াইপ্‌ল বলেন যে, নিউক্লিয়াস তার সব পদার্থকেই লেজ তৈরী করতে দিয়ে দেয় না। শতকরা 20 থেকে 30 ভাগ পদার্থ তার থেকেই যায়, যেটা ধ্বংসের পর এক ধরনের আলোর ঝরনা তৈরী করে।

এবার আসা যাক ধূমকেতুর কক্ষপথের আকৃতির কথায়! ধূমকেতু কিন্তু কখনই বৃত্তাকার পথে চলতে পারে না। অথচ বৃত্তাকার পথে চলবার জন্যেই উৎসুক হয়ে থাকে সে। কিন্তু ঘোরবার সময় গ্রহদের অভিকর্ষীয় টান ধূমকেতুকে একটি নাভিতে (focus) নিয়ে এসে উপবৃত্তাকার পথে ঘোরায়! তাই এদের পথ সাধারণতঃ উপবৃত্তাকার হতে পারে, যদিও বীলার ধূমকেতুকে পরা-বৃত্তাকার পথেও ঘুরতে দেখা যায়। সূর্যের থেকে যখন খুব কাছে থাকে এই ধূমকেতু তখন তাকে যে দূরত্বে দেখা যায় সেই দূরত্বকে বলে 'পেরিহেলিয়ন' আর যখন সব চাইতে দূরে থাকে সে সূর্যের থেকে, তখন সেই দূরত্বকে বলে 'অ্যাপি-হেলিয়ান'! আমাদের সুপরিচিত এবং বহুশ্রুত হ্যালীর ধূমকেতুটি 1910 সালে 'পেরিহেলিয়ন' অবস্থায় ছিল, আর 1948-এ 'অ্যাপিহেলিয়ন'-এ ছিল তার অবস্থান। এক 'পেরিহেলিয়ন' অতিক্রম করবার পর আবার সেই পেরি-হেলিয়নে ফিরে আসতে ধূমকেতুর যে সময় লাগে তাকে এক পর্যায় বা Period বলে। কিছু কিছু ধূমকেতুর এই পর্যায়-কাল খুবই ছোট (অর্থাৎ তারা ছোট ছোট উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে)। এইরকমই একটি ধূমকেতু 'এনকি'র ধূমকেতু যা সাড়ে তিন বছর পর পর দেখা পাবার কথা। কিন্তু এইসমস্ত ধূমকেতুগুলো এতই অনুজ্জ্বল হয় যে, খালি চোখে এদের দেখা যায় না। তখন ঐ ধূমকেতু-শিকারী টেলিস্কোপের সাহায্যে নেওয়া হয়। এবার একটা মজার জিনিস দেখতে পাওয়া গেল। যদি লেখা-চিত্রে কম পর্যায়বিশিষ্ট প্রায় 30 টি ধূমকেতুর কক্ষপথ অঙ্কন করা হয়, তবে দেখা যায় সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী অবস্থায় (*অ্যাপিহেলিয়ন*) এরা বৃহস্পতির কক্ষপথের কাছে গিয়ে পৌছায়। বৃহস্পতি গ্রহদের মধ্যে আকারে ও আয়তনে সবচাইতে বড়। এই ধূমকেতুগুলো বৃহস্পতির প্রবল ক্রিয়ায় তাদের নিজ নিজ কক্ষপথ থেকে থেকে খানিকটা বিচ্যুৎ হয়ে যায় এবং সূর্যের চারদিকে ছোট ছোট উপবৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকে। সেজন্যে কম পর্যায়বিশিষ্ট ধূমকেতুগুলোকে বৃহস্পতির সংসার বলা হয়। এইরকম শুধুমাত্র বৃহস্পতি নয়, আরও অন্যান্য গ্রহদেরও এমনি ধূমকেতু সংসার আছে। আমাদের সুপরিচিত হ্যালীর ধূমকেতুটি নেপচুনের ধূমকেতু-সংসারের একটি সদস্য। 75 বছর পর 1985 সালে এটিকে আবার দেখা যাবে।

এবার আমি আগেকার দিনের মানুষেরা ধূমকেতু সম্বন্ধে যে ভয় পেতেন, সেই প্রসঙ্গে আসছি। ধূমকেতু যখন তার কক্ষপথে ঘোরে, তখন সৌরজগতের যে কোন গ্রহের সঙ্গে তার সংঘর্ষ লাগা তেমন বিচিত্র কোনো ব্যাপার নয়! মানুষের ভয় ছিল এটাই। বিজ্ঞানীরাও এই আশংকাকে একদম উড়িয়ে দেন নি। তবে একবার একটা পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল যে, ধূমকেতুর লেজের মধ্যে বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস (সায়ানোজেন ও কার্বন মনোক্সাইড) থাকলেও তা পৃথিবীর কাছাকাছি এলেও, পৃথিবীর বায়ুস্তরে কোনো বিষময় প্রভাব ফেলতে পারে না। ধূমকেতুকে নিয়ে কিন্তু চিন্তার বা গবেষণার কোনো শেষ নেই। হয়ত একটি মত খাড়া করা হলো কোন এক সময়ে, পরবর্তীকালে দেখা নতুন উদ্ভূত আরেকটি ধূমকেতুর গতিপ্রকৃতি সেই মতকে নস্যাৎ করে দিল! তাই বিজ্ঞানীরা কোমর কষে লড়ছেন। ধূমকেতুর খেয়ালীপনাকে মানুষের মস্তিষ্কের কম্পিউটারে যাচাই করবার খেলায় নেমেছেন তাঁরা। আমাদের বিশ্বাস, একাজে তাঁরা নিশ্চয়ই সফল হবেন। আর আমরাও জানতে পারব অনেক অনুদ্‌ঘাটিত তথ্য।

পি-100 ইউনিক পার্ক, বেহালা, কলকাতা-34

সহজ কথায় রসায়ন ঃ [এগারো]

ধাতুর রাজা ঃ সোনা

অমরনাথ রায়

হ্যাঁ, রাজাই বটে।

কেমন সুন্দর হলুদ রঙ। কি দারুন ঔজ্জ্বল্য!

রঙ আর ঔজ্জ্বল্য—কোনটাই সহজে মলিন হয় না।

তাই তো সোনার এত কদর, 'ধাতুর রাজা' নামে এর পরিচয়।

মৌলদের পর্যায়সারণীর 79 নম্বর মৌল হচ্ছে সোনা। ল্যাটিন ভাষায় নাম Aurum. এই Aurum শব্দটির প্রথম দুটি অক্ষরকে নিয়ে সোনার চিহ্ন স্থির করা হয়েছে Au.

মানুষ আদিকাল থেকেই সোনা ব্যবহার করে আসছে। এর সুন্দর রঙ আর চোখ ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য আদিকালের মানুষদের মন হরণ করেছিল। সোনাকে তারা আপন করে নিয়েছিল। নারী-দেহের শোভা বর্ধন করেছিল সোনা সে যুগেই। আজও সেই ধারা অব্যাহত আছে। অলংকাররূপেই সোনার ব্যবহার আজও সর্বাধিক। অতি প্রাচীনকালেও মানুষ পণ্যদ্রব্যের বেচাকেনা শুরু করেছিল বিশুদ্ধ সোনা দিয়ে। যীশু খ্রীষ্ট জন্মাবার ছশো (600) বছর আগে এশিয়া মাইনরের 'লিডিয়া' নামক দেশে সোনার মুদ্রা যে ব্যবহৃত হত তার প্রমাণ মিলেছে। সোনার সেই মুদ্রায় থাকতো সরকারের শীল আর রাজার মুখের ছবি। আজও সেই ধারা অব্যাহত আছে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই। আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালিত হয় এবং অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলা হয় সোনার মাধ্যমেই। অনেক দেশে তামা, রূপা ও সোনার সঙ্কর ধাতু দিয়ে মুদ্রা তৈরী হয়। আমাদের দেশেও সোনার টাকা বা গিনির প্রচলন আছে অতি প্রাচীন কাল থেকে।

প্রাচীন ভারতের রাজা-বাদশারা স্বর্ণমুদ্রা উপহার বা উপঢৌকন দিতেন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের। স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে তাঁরা ব্যবসাবাণিজ্যও চালাতেন। বৃটিশ আমলের গিনি, এমন কি মোঘল যুগের স্বর্ণমুদ্রা এখনও আমাদের দেশে অনেকেই সযত্নে সংগ্রহ করে রেখেছেন। এ সংগ্রহের আর্থিক মূল্য যেমন আছে, তেমনি আছে ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

সোনা দিয়ে তড়িৎলেপন করা যায়। একে বলা হয় 'গোল্ড প্লেটিং'। 'গোল্ড সল' অর্থাৎ সোনার কলয়ডীয় দ্রবণ প্রস্তুত করা হয় সোনা দিয়ে। দাঁতের ফাঁক পূর্ণ করতেও সোনা ব্যবহৃত হয়। আবার কৃত্রিম উপায়ে সোনার সমস্থানিক তৈরি করে তাকে চিকিৎসার কাজেও লাগানো হয়।

সোনা নরম এবং সমস্ত ধাতুর মধ্যে সবচেয়ে প্রসারণশীল। এই দুই ধর্মের জন্যে সোনাকে পিটিয়ে অতি সূক্ষ্ম পাতে (0·00001 মিলিমিটার পুরু) পরিণত করা যায়। এক সময় বইয়ের মলাটে অক্ষর লেখার জন্যে সাধারণতঃ এ জিনিসটি ব্যবহার করা হত। এই সব অক্ষর আকর্ষণীয় ও বহুকাল যাবৎ অবিবর্ণ থাকে, অথচ এর দামও খুব বেশি নয়।

এতক্ষণ তো সোনার নানারকম ব্যবহারের কথা বললাম। এবারে ধাতুটির মোটামুটি একটা পরিচয় দেওয়া যাক। নীরস হলেও এ তথ্যগুলি জেনে রাখা ভাল।

মৌল এবং যৌগ দু' রকমভাবেই সোনা ছড়িয়ে আছে প্রকৃতিতে। পাথরের শিরায় (rock vein) ও কোয়ার্জে সোনা থাকে মৌল অবস্থায়। এ ভিন্ন অ্যালুভিয়াল সঞ্চয়ে অনেক সময় সোনাকে পাওয়া যায় তাল বা পিণ্ড (nugget) রূপে। তবে প্রকৃতিজাত সোনার সঙ্গে সব সময়ে রূপা মিশে থাকে। সোনার অল্প কয়েকটি খনিজ আছে। তার মধ্যে ক্যালাভেরাইট (Calaverite) এবং সিলভানাইট (Sylvanite) অন্যতম। ভূত্বকে $5 \times 10^{-7}\%$ সোনা আছে। সাগরের জলের প্রতি দশ লক্ষ ভাগে মাত্র 0.002 ভাগ সোনা আছে। আমাদের দেশের সুবর্ণরেখা নদীর বালির সঙ্গে অল্প পরিমাণে মিশে আছে মৌল সোনা। তা উদ্ধারও করা যায়, কিন্তু তা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। সোনার আকরিক থেকে আজকাল 'সায়ানাইড' পদ্ধতিতে ধাতুটিকে নিষ্কাশন করা হয়। ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের কোলার খনি থেকে সোনা উদ্ধার করা হয়, কিন্তু উৎপাদন খুবই কম।

সোনা নরম ধাতু বলে বিশুদ্ধ সোনা দিয়ে অলংকার প্রস্তুত করা যায় না। অলংকার প্রস্তুতির জন্যে সোনার সঙ্গে পরিমিত তামা মিশিয়ে সংকর ধাতু তৈরি ক'রে নেওয়া হয়। সোনার বিশুদ্ধতা মাপা হয় ক্যারাট (Carat) এককে। 24 ভাগ সোনার সংকরধাতুতে যত ভাগ বিশুদ্ধ সোনা থাকে, তাকে তত ক্যারাট সোনা বলে।

যদি বলি '14 ক্যারাট সোনা', তা হলে বুঝতে হবে যে 24 ভাগ অবিশুদ্ধ সোনায় 14 ভাগ বিশুদ্ধ সোনা আছে। 22 ক্যারাট সোনাকে বলা হয় 'গিনি সোনা', আর 24 ক্যারাট সোনাকে বলা হয় বিশুদ্ধ বা পাকা সোনা। স্বর্ণকারেরা পুরনো স্বর্ণালংকারকে গলিয়ে খাদ বা অবিশুদ্ধি বাদ দিয়ে তাকে পাকা সোনায় পরিণত ক'রে নিয়ে তবে সেই সোনা কেনেন বা তার মূল্য নির্ধারণ করেন।

ইন্দা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

অনীশ দেব

গ্যালিলিও, ফ্যারাডে ও ডেভি

যে তিনজন বিজ্ঞানীর নাম ওপরে লিখেছি তাঁদের নাম নিশ্চয়ই তোমরা সবাই শুনেছো। বুদ্ধি ও পরিশ্রম দিয়ে প্রকৃতির বহু রহস্যই ভেদ করেছেন এই তিন বিজ্ঞানী। কিন্তু রহস্য ভেদ করার পথে তাঁরা যে কোন রকম বাধা পান নি তা নয়। এক দল গেছে তাঁদের মতের পক্ষে, আর একদল বিপক্ষে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি ভয়ে পিছিয়ে গেছেন বিজ্ঞানীরা? মোটেই নয়। সব কিছুকে জানার আগ্রহ নিয়ে যে সব মানুষ জন্মায় তারা চলে সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পথে—বৈজ্ঞানিক প্রমাণের সাহায্যে। কোন কিছু আবিষ্কার করার ফলে নিজের কি লাভ বা ক্ষতি হবে সেকথা প্রকৃত বিজ্ঞানী কখনও ভাবেন না। এই প্রসঙ্গে প্রথমে বলি গ্যালিলিওর কথা।

1591 সালের এক সকাল। পিসার হেলানো মিনারের নিচে ভিড় করেছেন দর্শকরা। দর্শকদের মধ্যে রয়েছেন পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সদস্য। এই জমায়েতের কারণ কি? না, এক তরুণ অধ্যাপক এক মজার পরীক্ষা দেখাবেন সকলকে। ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন তরুণ অধ্যাপক। সাত তলায় পৌঁছে থামলেন। তাঁর হাতে দুটো বল। একটা বল আরেকটার চেয়ে একশো গুণ ভারী। উদ্‌গ্রীব মানুষগুলোর চোখের সামনে একই সঙ্গে বল দুটো নিচে ফেলে দিলেন তরুণ গ্যালিলিও। একই সঙ্গে পড়তে লাগলো দুটো বল। অবশেষে একই সঙ্গে স্পর্শ করলো মাটি। ফলে দু হাজার বছরের পুরোনো একটি ভুল ধারণার মৃত্যু হলো। মানুষ পেলো সঠিক উত্তর। সব বস্তুকেই পৃথিবী সমান জোরে নিচে টানে।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা মোটেই খুশি হলেন না। ঘরে ফেরার পথে তাঁদের একজন বললেন, 'এই গ্যালিলিও লোকটা বড্ড ঝামেলার। আমরা এতদিন ধরে জেনে এসেছি, একটা বল আরেকটা বলের চেয়ে একশো গুণ ভারী হলে সেটা একশো গুণ জোরে নেমে আসবে মাটির দিকে। এই সামান্য একটা বাজে পরীক্ষা দেখিয়ে ও কি আমাদের সত্যি বিশ্বাসটাকে ভেঙে দিতে চায়? এভাবে ওপরওলাদের অপমান করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। লক্ষ্য রাখতে হবে, এই লোকটা যেন আর না বাড়তে পারে।'

তোমরা তো ভালো করেই জানো, শেষ পর্যন্ত জয় কার হয়েছিল।

মাইকেল ফ্যারাডে

এবারে আসি মাইকেল ফ্যারাডের কথায়।

একবার লণ্ডনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতা দিতে গেছেন ফ্যারাডে। বক্তৃতায় তিনি বললেন, একটা চুম্বককে যদি হঠাৎ কোন তারের কুণ্ডলীর কাছে নিয়ে আসা হয় তা হলে কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি হবে। পরীক্ষার মাধ্যমে বক্তব্যটি সভার সামনে প্রমাণও করে দেখালেন ফ্যারাডে। কিন্তু সভার দর্শকরা তেমন উৎসাহ পেলেন না পরীক্ষা দেখে। এ আর এমন কি পরীক্ষা? ফলে গুঞ্জন উঠলো সভার মধ্যে। অবশেষে একজন ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালেন। সমস্ত দর্শকের প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন মাইকেল ফ্যারাডেকে লক্ষ্য করে: 'কিন্তু প্রফেসর, আপনার এই পরীক্ষা মানুষের কোন্ কাজে লাগবে বলবেন কি?' তখন ফ্যারাডে যে উত্তর দিয়েছিলেন তা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, 'একটা সদ্যোজাত শিশু আমাদের কোন্ কাজে লাগে সেটা দয়া করে বলবেন কি?'

আর একবার একটা আলোচনা-সভা বসেছিল ইংল্যাণ্ডে। আলোচনায় হাজির ছিলেন ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী কৃতবিদ্য পুরুষ উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন ও অন্যান্য কয়েকজন। মাইকেল ফ্যারাডে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন আবিষ্কারের কথা বুঝিয়ে বলছিলেন সবাইকে। সব শোনার পর গ্ল্যাডস্টোনের মতো মানুষ ছোট্ট মন্তব্য করে বললেন, 'সবই তো বুঝলাম, কিন্তু এতে লাভ কি হবে?'

মাইকেল ফ্যারাডে হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'কেন, স্যার, আমার তো মনে হচ্ছে কিছু দিনের মধ্যেই আপনি এর ওপরে ট্যাক্স বসাতে পারবেন!'

উত্তরে লজ্জিত গ্ল্যাডস্টোন কি বলেছিলেন তা জানা যায়নি।

তড়িৎ-চৌম্বক বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের পর ফ্যারাডের খ্যাতি এত ছড়িয়ে পড়েছিল যে তখন ইচ্ছে করলে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শদাতার কাজ করে প্রচুর টাকা উপার্জন করতে পারতেন ফ্যারাডে। কিন্তু তা তিনি করেন নি। বিজ্ঞানী বন্ধু টিণ্ডাল্‌কে ফ্যারাডে বলেছিলেন, 'আমার জীবনে এমন একটা সময় এসেছিল যখন নিজেকে আমি প্রশ্ন করেছি—কি চাই আমি? বিজ্ঞান গবেষণা, না টাকা? দুজন প্রভুর দাসত্ব আমি কই সঙ্গে করতে পারবো না? অবশেষে বিজ্ঞানকেই আমি বেছে নিয়েছি।'

টিণ্ডাল বলেছেন, 'জীবনের তিরিশ বছরে মাইকেল ইচ্ছে করলে তিন লক্ষ পাউণ্ড স্টারলিং উপায় করতে পারতো। কিন্তু তা সে করে নি। ফলে গরীব অবস্থাতেই সে মারা গেছে। তবে অর্থের বিনিময়ে কি সে অর্জন করেছে তা প্রত্যেক পৃথিবীবাসীমাত্রই জানে।'

খনি-শ্রমিকদের কাজের জন্যে 'নিরাপত্তা-বাতি' আবিষ্কার করেছিলেন স্যার হামফ্রি ডেভি। তোমরা সকলেই হয়তো জানো তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের কথা। কিন্তু এ-খবরটা হয়তো জানো না, নিজের আবিষ্কারটির কোনো পেটেণ্ট নেন নি ডেভি। তাঁর এক বন্ধু জন বাড্‌ল্‌ ডেভিকে বলেছিলেন, 'তোমার এই আবিষ্কারের পেটেণ্ট নিলে তুমি বছরে পাঁচ দশ হাজার পাউণ্ড আয় করতে পারতে।'

উত্তরে ডেভি বলেছিলেন, 'না, বন্ধু। পেটেণ্টের কথা কখনও আমি ভাবি নি। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতির সেবা করা। যদি সে কাজে আমি সফল হয়ে থাকি, তা হলে সফল হওয়ার সেই কৃতজ্ঞতা ও আনন্দই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।'

সুতরাং এই উদাহরণ থেকেই তোমরা হয়তো বুঝতে পারবে, বিজ্ঞান-সাধনা হলো প্রকৃতপক্ষে সত্য এবং মানবজাতির নিঃস্বার্থ সেবা।

টেনিসনের কবিতা ও চার্লস ব্যাবেজ

ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত অঙ্কবিদ চার্লস ব্যাবেজকে বলা হয় আধুনিক কম্পিউটারের জনক। শুধু কম্পিউটার নয়, অন্যান্য বিষয়েও একটু-আধটু আগ্রহ ছিল মানুষটির। নতুন ধরনের ডাকব্যবস্থা চালু করেছিলেন তিনি, স্পীডো-মিটার ও সবখোল্‌ চাবি আবিষ্কার করেছিলেন, কবিতা লিখতেন, এমন কি পার্লামেণ্টেও দাঁড়িয়েছিলেন।

অঙ্ক নিয়ে মাতামাতি করাটা ব্যাবেজের শুধু যে নেশাই ছিল তা নয়, পেশাও ছিল। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে

চার্লস ব্যাবেজ

অধ্যাপনা করতেন তিনি। একবার চার্লস ব্যাবেজ প্রখ্যাত কবি লর্ড টেনিসনকে ভারী মজার একটা চিঠি লিখেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের ঘটনা। লর্ড টেনিসন তাঁর একটি কবিতার দুটি লাইনে লিখলেন—

এভরি মোমেণ্ট ডাইজ এ ম্যান
এভরি মোমেণ্ট এ ম্যান ইজ বর্ন।

অর্থাৎ, 'প্রতি মুহূর্তে একজন মানুষ মারা যাচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্তে একজন মানুষ জন্ম নিচ্ছে।' কবিতার লাইন দুটি পড়ার পর ব্যাবেজ লর্ডকে লিখলেন—মহাশয়,

আপনার সাম্প্রতিক কবিতার দুটি লাইনে আপনি যা লিখেছেন তা যদি সত্যি হত তা হলে পৃথিবীর জন সংখ্যা মোটেই বাড়ত না। দিনের পর দিন একই থাকত। আমি ব্যাপারটা নিয়ে অনেক হিসেবপত্র করেছি। তাতে দেখলাম, কবিতার লাইন দুটি হওয়া উচিত: প্রতি মুহূর্তে একজন মানুষ মারা যাচ্ছে, এবং প্রতি মুহূর্তে $1\frac{1}{16}$ জন মানুষ জন্ম নিচ্ছে। যদিও জন্মের সংখ্যার সঠিক হিসেবটা দশমিকের পর অনেকগুলো ঘর পর্যন্ত আমি কষে বের করেছি, তবুও মনে হয় আপনার কবিতার জন্য $1\frac{1}{16}$ লিখলেই মোটামুটি কাজ চলে যাবে।

ইতি বিশ্বস্ত চার্লস ব্যাবেজ।

চিঠির উত্তরে লর্ড টেনিসন কি লিখছিলেন তা জানি না, কিন্তু এ ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমরা চার্লস ব্যাবেজের সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় পাই।

ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলি-9

জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

সুধাংশু পাত্র

বর্তমান বছরে অক্টোবর মাসটিতে দু দুজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় বিজ্ঞানীর জন্মশতবার্ষিকী হলো। এঁদের একজন হলেন প্রখ্যাত রসায়ন বিজ্ঞানী আচার্য পঞ্চানন নিয়োগী এবং অপরজন ভূতত্ত্ববিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক ডঃ ডি. এন. ওয়াদিয়া।

আচার্য পঞ্চানন নিয়োগী

আচার্য নিয়োগীর মতো রসায়ন-বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদান খুব কম ভারতীয় বিজ্ঞানীরই আছে। ভৌত, অজৈব ও জৈব ত্রিবিধ শাখায় তিনি গবেষণা করেছিলেন এবং প্রতিটি শাখায় রেখে গেছেন কৃতিত্বের স্বাক্ষর।

আচার্য নিয়োগীর সর্বপ্রধান কৃতিত্ব মনে হয় তৎকালীন আবিষ্কৃত গেলিয়াম নামক ধাতুটি সম্বন্ধে গবেষণা। মূল ধাতুটির আবিষ্কারক তিনি না হলেও গেলিয়ামের কতকগুলি যৌগের তিনি আবিষ্কর্তা। তা ছাড়া গেলিয়ামের ধর্ম ও গুণাগুণ তিনিই বিশ্লেষণ করেছিলেন। অজৈব রসায়নে তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান দস্তা ও ক্যাডমিয়ামের সঙ্কর প্রস্তুতি।

রসায়নের অন্যান্য শাখায় নিয়োগীর গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলির মধ্যে আছে 'জিওমেট্রিক্যাল ইনভারসান' নামক একটি থিয়োরি এবং 'রেসোনেন্স রিঅ্যাকশন' নামে একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

1883 খ্রীষ্টাব্দের 4 অক্টোবর হুগলী জেলার হেরো নামক গ্রামে এক অতি দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা শশিভূষণের বিষয়সম্পত্তি কিছুই ছিল না। সামান্য বেতনের একটি চাকরি ছিল সম্বল। ওতেই কায়ক্লেশে সংসার চালাতেন এবং পুত্রের লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহন করতেন।

বালক পঞ্চানন ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। ছাত্রজীবনে প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় স্থান কোনদিন অধিকার করেন নি।

কলিকাতার আর্যমিশন স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাশ করার পর ডাফ্ কলেজে এফ. এ পড়েন। 1901 সালে এফ. এ পাশের পর আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সান্নিধ্য লাভের আশায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে মনস্থ করেন। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়াতেন না এবং জগদীশচন্দ্রও সে বছর বিলাত গমন করলেন। তাই প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি না হয়ে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজে ভর্তি হলেন। 1903 সালে রসায়নে অনার্স সহ পাশ করলেন বি. এ। সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্যে লাভ করলেন উড্রো বৃত্তি এবং গঙ্গাপ্রসাদ সুবর্ণ পদক। এগুলি ছাড়াও তিনি লাভ করেছিলেন সরকারি বৃত্তি।

এরপর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আচার্য রায়ের সান্নিধ্যে আসেন। 1905 সালে রসায়নে এম. এ পাশ করেন এবং লাভ করেন একশ টাকার গবেষণামূলক বৃত্তি। 1906 সালে লাভ করেন গ্রিফিথস্ মেমোরিয়াল প্রাইজ ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি। এবার তিনি রাজসাহী কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। 1920 সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের পর ফিরে আসেন কলিকাতায় এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে অস্থায়ী অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। এর পর শিবপুরে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেছিলেন। 1925 সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ তাঁকে স্থায়ী অধ্যাপকের পদে গ্রহণ করে।

আচার্য নিয়োগীর অধিকাংশ গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে রাজসাহী কলেজ থেকে কলকাতায় ফিরে আসার পর। গেলিয়ামের উপর গবেষণাই তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছিল।

আচার্য নিয়োগী একজন সুবক্তা ও সুলেখকও ছিলেন। ইংরেজিতে লেখা তাঁর দুখানি বই 'আয়রন ইন এনসেন্ট ইণ্ডিয়া' এবং 'কপার ইন এনসেন্ট ইণ্ডিয়া' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাভাষায় রচিত বইগুলির মধ্যে 'আয়ুর্বেদ ও রসায়নশাস্ত্র' নামক বইটি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়।

বাংলা 1357 সালের 22 জ্যৈষ্ঠ তিনি পরলোক গমন করেন।

জাতীয় অধ্যাপক ডি. এন ওয়াদিয়া

ভূতত্ত্ব ও খনিজবিদ্যা বিষয়ে যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় ভারতীয় বিজ্ঞানী জগৎজোড়া খ্যাতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে জাতীয় অধ্যাপক দারাশ নশেরওয়ান ওয়াদিয়া অন্যতম।

অধ্যাপক ওয়াদিয়া 1883 খ্রীষ্টাব্দে 23 অক্টোবর সুরাটে জন্মগ্রহণ করেন। 1916 খ্রীষ্টাব্দে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূতত্ত্বে এম. এ. পাশ করার পর তিনি জম্মুর প্রিন্স অব ওয়েলস কলেজে ভূতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছর কাল অত্যন্ত যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার পর 1920 খ্রীষ্টাব্দে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে যুক্ত হন।

1934 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ওয়াদিয়া উত্তর ভারতের বিভিন্ন-স্থানে সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। বিশেষত পিরপাঞ্জাল, হাজারা ও কাশ্মীর ও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে তিনি যে সব সমীক্ষা চালিয়েছিলেন তা নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একদিকে যেমন বহু আকরিকের সন্ধান লাভ করেছিলেন, অপরদিকে তেমনই উদঘাটন করেছিলেন কতকগুলি মূল্যবান তথ্য। একটি চমকপ্রদ তথ্য হলো, ভূতাত্ত্বিক বিচারে বর্তমান কেনোজোয়িক মহাযুগের মধ্যভাগে ওলিগোসিন ও মিওসিন যুগের সন্ধিক্ষণে যে একটানা শুষ্ক প্রবাহ প্রবাহিত হয়েছিল, তাতে এক বিশাল শুষ্ক ভূমি-বলয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই শুষ্ক বলয় উত্তর পশ্চিম পাঞ্জাব, হাজারা ও কাশ্মীর অঞ্চল থেকে সুদূর পামির পর্যন্ত ছিল বিস্তৃত। অন্যান্য সমীক্ষা থেকে তিনি আরও প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, ভারতের রাজস্থান পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলের ভূমি প্রায় দেড়শ কোটি বছর আগে সংঘটিত হয়েছিল।

1938 খ্রীষ্টাব্দে ওয়াদিয়া সিংহল সরকারের খনিজ বিষয়ে উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরের বছর থেকে তিনি পুনরায় একদল সমীক্ষক নিয়ে ভারতের বিভিন্ন খনি অঞ্চল, উপত্যকা ও পার্বত্য অঞ্চল পরিদর্শন করতে থাকেন। 1945 খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি ন্যাশান্যাল ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্সের সভাপতি নিযুক্ত হন।

দেশবিদেশের বহু ভূতাত্ত্বিক সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি। তাই বহুবার তাঁকে বিদেশ ভ্রমণ করতে

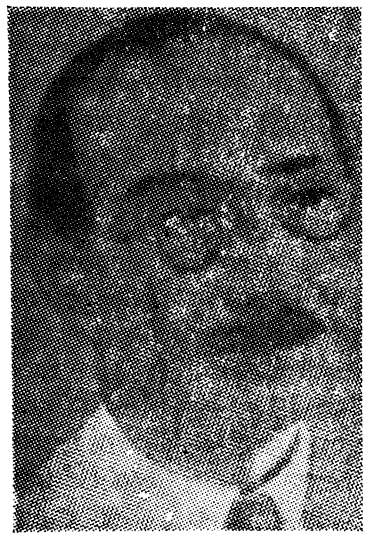

ডঃ ডি, এন, ওয়াদিয়া

হয়েছে। জীবনে বহু সম্মান ও বহু পুরস্কার লাভ করেছিলেন তিনি। লণ্ডনের জিওলজিক্যাল সোসাইটি তাঁকে প্রদান করেছিলেন লায়েল পদক। লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি এবং জার্মান জিওলজিক্যাল সোসাইটি তাঁকে ফেলোও নির্বাচিত করেছিলেন। ভারত সরকার তাঁকে 1958 সালে পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন এবং 1960 সালে জাতীয় অধ্যাপকের সম্মান দান করেন। 1942 ও 1943 সালে তিনি পরপর দুবার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন।

ডঃ ওয়াদিয়া একাধিক মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা। ভারতের খনিজ সম্বন্ধে তাঁর লেখা বইগুলি জাতীয় সম্পদ-বিশেষ। শেষ বয়সে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতাত্ত্বিক ও পারমাণবিক শক্তি কমিশনের প্রধান উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছিলেন। 1969 সালে 10 জুন পঁচাশি বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

কালিন্দী, মেদিনীপুর

বিজ্ঞানভিত্তিক ধারাবাহিক উপন্যাস

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সবুজ বনের গান

ছয়

॥ শত্রুদলের কবলে ॥

ঘরের ভেতর ঢুকে অবাক হয়ে গেলুম। একটা ছোট্ট মেরিন মিউজিয়াম! রোমিলা সুইচ টিপে বাতি জেলে দিলে মনে হল এই যাদুঘর বহুকাল খোলা হয় নি। ঘরে কেমন একটা ঝাঁঝালো গন্ধ। একটা মোটা জানলা আছে। সেটা জাহাজের পোর্টহোলের মতো গোলাকার। কিন্তু আকারে বড়। মোটাসোটা লোহার গারদ আছে। সমুদ্রের মানুষের জীবনের অনেক স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। জংধরা নোঙর, কাছির বাণ্ডিল, নাবিকদের কুঠার, হালের টুকরো, এইরকম সব জিনিস। দেয়ালে পুরনো আমলের জলদস্যুদের ব্যবহৃত বন্দুক পিস্তল তলোয়ার ছুরি আর তিমিশিকারের হারপুন হুকে আটকানো রয়েছে। আর আছে সমুদ্রপ্রাণীদের অসংখ্য স্টাফকরা নমুনা। কত রকমের শঙ্খ, ঝিনুক, কাছিম, হাঙর, বারাকুদা মাছ, তিমির দাঁত এবং আরও কত প্রাণী। সমুদ্র অঞ্চলের কিছু পাখিও স্টাফ করা হয়েছে। দেখে মনে হয় ওরা জীবত।

কর্ণেল বললেন, 'মিঃ রাজাকো দেখছি ট্যাক্সিডার্মি অর্থাৎ চামড়াবিদ্যায় খুব দক্ষ ছিলেন।'

ডঃ বিকর্ণ বললেন, 'এই অ্যালবাট্রস পাখিটাকে দেখুন। যেন ডানা মেলে এখুনি উড়ে যাবে।'

রোমিলার কুকুর পাণ্ডো দেখতে কতকটা বেড়ালের মতো। গায়ে ঘন শাদা লোম। এমন ক্ষুদে কুকুর কস্মিন্‌ কালে দেখি নি। সে হঠাৎ রোমিলার কোল থেকে নেমে হাঙরটার কাছে দৌড়ে গেল। এবার দেখলুম, হাঙরটার মুখে একটুকরো বুমেরাঙ আকৃতির কাঠ আটকানো আছে। পাণ্ডো গিয়েই সেই বাঁকা ছোট্ট কাঠটা কামড়ে ধরে বের করল। রোমিলা বলল, 'আঃ! কী হচ্ছে পাণ্ডো? দুষ্টুমি করে না এখন।'

তারপর ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা। বুমেরাং কাঠটা পাণ্ডোর মুখ থেকে প্রকাণ্ড পোকার মতো নড়াচড়া করতে করতে ছিটকে চলে গেল। পাণ্ডো ভয় পেয়ে রোমিলার পায়ের কাছে গুটিসুটি বসে পড়ল। কর্ণেল এগিয়ে গিয়ে কাঠটা তুলেছেন, আবার ওটা কিলবিল করে নড়ে ছিটকে পড়ল। তারপর লাফাতে লাফতে হাঙরটার মুখের ভেতর ঢুকে পড়ল। আমরা হাঁ করে দেখছিলুম ব্যাপারটা।

ডঃ বিকর্ণ বললেন, 'সর্বনাশ! এ আবার কী প্রাণী?'

কর্ণেল একটু হেসে বললেন, 'এ যে দেখছি কেঠো পোকা দেখতে কাঠ, আসলে পোকা।'

ব্যুগেনভিলি কী যেন ভাবছিলেন। এতক্ষণে ব্যস্তভাবে বললেন, 'কী আশ্চর্য! কিওটা দ্বীপে ঠিক এই আজব পোকাই দেখেছিলুম। ঘাসের মধ্যে পড়েছিল। দেখে মনে হয়েছিল বুমেরাং। কিন্তু যেই কুড়িয়ে নিয়েছি, অমনি হাত থেকে ছিটকে চলে গেল। কর্ণেল, ডঃ বিকর্ণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস মিঃ রাজাকো কিওটা দ্বীপের সন্ধান জানতেন।'

কর্ণেল কোনো জবাব দিলেন না। র‍্যাক থেকে একটা বাঁধানো মোটা খাতা নামিয়ে পাতা ওল্টালেন। তারপর বললেন, 'জাহাজের লগবুক দেখছি। 1912 সালের লগবুক। সান্টা মারিয়া জাহাজ! হুঁ ক্যাপ্টেনের নাম জিয়োভিল্লো সার্ভেন্টিস! পর্তুগিজ মনে হচ্ছে। রোমিলা, তুমি কি কখনো এ ঘরে ঢুকেছ?

রোমিলা বলল, 'না কর্ণেল, বাবা বেঁচে থাকতে কাউকে এঘরে ঢুকতে দিতেন না।'

র‍্যাকের একটা জায়গা দেখিয়ে কর্ণেল বললেন, 'এখানে ধুলোময়লা নেই—এই চারকোণা অংশটাতে। অথচ র‍্যাকের সবখানে ধুলোময়লা প্রচুর। তার মানে এখানে চৌকো কোনো জিনিস—সম্ভবত আরেকটি লগবুক ছিল। চোর সেটাই নিয়ে গেছে।'

রোমিলা ক্ষুব্ধভাবে বলল, 'কে তালা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে একটা লগবুক নিয়ে গেল, বুঝতে পারছি না। আমার লোকেরা তো সবাই বিশ্বাসী!'

ডঃ বিকর্ণ বললেন, 'তবু ওদের জিগ্যেস করা দরকার।

কর্ণেল বললেন, 'রোমিলা এই লগবুকটা আমি নিয়ে যেতে চাই। দেখা শেষ হলে ফেরত দেব।'

রোমিলা বলল, 'কোনো আপত্তি নেই, কর্ণেল! ব্যাপারটা আমারও জানা দরকার? কেন বাবাকে খুন করা হ'ল, এ ঘরের তালা ভেঙ্গে কেন চোর ঢুকল--সব রহস্য না জানলে শান্তি পাব না।'

ড্রয়িংরুমে ফিরে গেলুম আমরা। রোমিলা তার পরিচারিকাকে ডেকে যাদুঘরের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলল। বুঝলুম, কর্মচারীদের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস।

একজন কর্মচারীর নাম বেনিয়া। সে রোমিলার প্রাইভেট সেক্রেটারী। অন্যজনের নাম পিত্তবের্দেনে। সম্ভবত প্রিয়বর্ধন। বেনিয়া বলল, সে অনেকগুলি চিঠি টাইপ করতে ব্যস্ত ছিল। কিছু লক্ষ্য করে নি। পিওবের্দেনে বা প্রিয়বর্ধন বলল, সে কিচেনে খাবার তৈরি করছিল। সেও কিছু লক্ষ্য করে নি।

ঘরের ভেতর ঢুকে অবাক হয়ে গেলুম।

লক্ষ্য করার কথাও নয়। ঘরটা পেছনের দিকে। ওপাশে ফুলবাগান ঝোপঝাড়, গাছপালা। কর্মচারীরা চলে গেলে ডঃ বিকর্ণ বললেন, 'তোমার পরিচারিকাকে ডাকো এবার।

পরিচারিকাটি রোমিলার বয়সী। সে ছেলেবেলা থেকে রোমিলার সঙ্গিনী। নাম মিত্রালা। দেখতে চীনাদের মতো। সে বলল কিচেনে প্রিয়বর্ধনের সঙ্গে কাজ করছিল। তবে পাণ্ডো একবার বসে তার পায়ে মুখ ঘষেছিল। এটা পাণ্ডোর ভয় পাওয়ার লক্ষণ। মিত্রালা ভেবেছিলো, আজও বুঝি সাপটাপ দেখে ভয় পেয়েছে পাণ্ডো। এই টিলায় খুব সাপের উৎপাত আছে। মাঝে মাঝে বাগানে চলে আসে, মারাও পড়ে। মিঃ রাজাকো ছিলেন খেয়ালী মানুষ। নৈলে এমন জংলা পাহাড়ে কেউ বাড়ি বানাতে চায়?

কর্ণেল লগবুক নিয়ে মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রোমিলা আমি আরেকবার যাদুঘরে যেতে চাই।'

'রোমিলা বলল, 'আসুন।'

কর্ণেল হন্তদন্ত তার সঙ্গে চলে গেলেন। ডঃ বিকর্ণ মুচকি হেসে বললেন, 'ও'র যাওয়া দেখে মনে হল যেন শিকারের গন্ধ পেয়েছেন।'

আমার প্রাজ্ঞ বন্ধুর প্রশংসার সূত্র পেলেই আমার মুখ খুলে যায়। বললুম, 'ও'র পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়, ডঃ বিকর্ণ! হয়তো দেখবেন, এখনই এসে বলবেন কিওটা দ্বীপের সন্ধান পেয়ে গেছেন।'

ব্যুগেনভিলি বললেন, 'এবং মিঃ রাজাকোর হত্যারহস্যেরও।'

ডঃ বিকর্ণ গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বললেন, 'রাজকোর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কিওটা দ্বীপের যোগসূত্র আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য ওই কাত্তির ব্যাপারটা একটু গোল বাধাচ্ছে। তা হলেও বলব ক্যাপ্টেন ব্যুগেনভিলি, রাজকোর অনেক শত্রু ছিল। যেমন ধরুন ও'র মাছের ব্যবসার প্রতিদ্বন্দ্বী কিয়াং। একসময় দুজনে একই সঙ্গে কারবার করেছেন। দক্ষিণ সমুদ্রে তিমিশিকারেও গেছেন দুজনে। পরে কি নিয়ে বিবাদ হয়েছিল যেন। তারপর থেকে বুবিদ্বীপে প্রায়ই দুজনের সাঙ্গপাঙ্গরা খুনোখুনি করত পরস্পর। পুলিশ হিমসিম খেত দাঙ্গা থামাতে।'

ক্যাপ্টেন ব্যুগেনভিলি বললেন, 'কিয়াং এখন কী করেন ?'

'কিয়াং তো এ তল্লাটের সেরা ডুবুরি। ওর একটা স্কুনার (ছোট জাহাজ) আছে ! মুক্তো খুঁজে বেড়ায় সমুদ্রের তলায়। সে এখন কোটিপতি লোক। থাকে পাশের দ্বীপ কারো আইল্যাণ্ডে।'

এইসব কথাবার্তা বলতে বলতে কর্নেল এসে গেলেন রোমিলার সঙ্গে। খুব প্রত্যাশা নিয়ে ধুরন্ধর বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালুম। এই বুঝি বলে উঠবেন, ইউরেকা !

কিন্তু কোথায় কী। আরও তুচ্ছো মুখে চুপচাপ বসে পড়লেন। রোমিলা বলল, 'আরেকপ্রস্থ কফি বলে আসি।

সে চলে গেলে কর্নেল বললেন, 'কিওটার রহস্যময় স্পিকিং উডদের একটুকরো সেরা নমুনা ছিল ও ঘরে। ক্যাপ্টেন সার্ভেণ্টিসের এই লগবুকে তার উল্লেখ আছে। ডঃ বিকর্ণ, যে জিনিসটা ওঘর থেকে চোর নিয়ে গেছে, সেটা আরেকটা লগবুক নয়। কাঠের তৈরি একটা চমৎকার ভাস্কর্য। আর সে কাঠ কিওটা দ্বীপের গাছের। এই দেখুন, লগবুকে ক্যাপ্টেন সার্ভেণ্টিস সেটা এঁকেও রেখেছেন।'

আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়লুম। পর্তুগিজ ক্যাপ্টেন ভদ্রলোক অপূর্ব ছবি আঁকতে পারতেন বটে! তবে ভাস্কর্যটিও ছিল অসাধারণ! সুন্দর এক দেবীমূর্তি। হাতে বীণা কতকটা আমাদের দেবী সরস্বতীর মতো দেখতে। শুধু বাহন হিসেবে কোনো হাঁস নেই, এই যা তফাত। মূর্তিটা চৌকো একটা বেদীতে বসানো ছিল।

কল্পনা করলুম, জনহীন কিওটা দ্বীপে জ্যোৎস্নার রাতে ওই দেবী আপন মনে বীণা বাজাচ্ছেন। তাঁর পায়ের নিচে সমুদ্র সব উচ্ছ্বাস থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে শুনছে।

এই সময় ক্যাপ্টেন ব্যুগেনভিলি বলে উঠলেন, 'আশ্চর্য! আমার যেন মনে পড়ছে! আচ্ছন্নতার ঘোরে কিওটার বেলাভূমিতে শুয়ে মধুর বাজনা শুনেছিলুম। তা হলে কি স্বপ্ন নয় ?'

'সঙ্গীতকারী বৃক্ষ!' ডঃ বিকর্ণ বললেন, এ এলাকায় লোকেরা বংশপরম্পরায় বিশ্বাস করে আসছে সঙ্গীতকারী বৃক্ষের কথা! কিন্তু কোথায় সেই রহস্যময় দ্বীপ ?'...

রোমিলার কাছ থেকে এক সময় বিদায় নিয়ে আমরা হোটেলে ফিরলুম। ডঃ বিকর্ণ আমাদের পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন।

লাঞ্চের পর কর্নেল ব্যালকনিতে গিয়ে সেই লগবুক খুলে বসলেন। আমার বরাবর ভেতো বাঙালী-স্বভাবে খাওয়ার পর ঝিমুনি ধরে। ঝিমুনি কেটে গেল ফোনের আওয়াজে। অপারেটর বলল, 'কথা বলুন!'

রোমিলার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর কানে এল। 'কর্নেল ? আমি রোমিলা। শুনুন কর্নেল ..

'না, আমি জয়ন্ত বলছি। ডেকে দেব কর্নেলকে ?'

'দিন না প্লিজ!'

কর্নেলের কানে গিয়েছিল। এসে ফোন ধরলেন। একটু পরে ফোন রেখে হাসলেন। 'ডার্লিং! রোমিলার পরিচারক-কাম-বাবুর্চি সেই প্রিয়বর্ধন বা পিওবর্দেনে হঠাৎ নিপাত্তা হয়ে গেছে।'

'নিশ্চয় সে-ব্যাটাই চোর!'

'তা আর বলতে?'বলে কর্নেল ব্যালকনিতে ফিরে গেলেন।

আমার ফের ঝিমুনি চাপল। অভ্যাস যাবে কোথায় ? কখন ঘুমিয়ে গেছি—অথচ কর্নেল পই পই করে দিনে ঘুমোতে নিষেধ করেন। সামুদ্রিক নোনা আবহাওয়ায় দিনে ঘুমুলে নাকি শরীর ফুলে ঢোল হয়ে যায়।

একট. বিকট দুঃস্বপ্ন দেখছিলুম। যেন অথৈ সমুদ্রে পড়ে গেছি আর হাঙর হাঁ করে গিলতে আসছে। ভাগ্যিস, ঘুমটা ভেঙে গেল। বহাল তবিয়তে আছি দেখে আশ্বস্ত হলুম।

কর্নেল বেরিয়েছেন কোথায়। একটু রাগ হল। এক সঙ্গে এসেছি। অথচ এমন করে কোথায় কোথায় চলে যাচ্ছেন, আমি একা মনমরা হয়ে ফুলো মুখে বসে থাকছি। কোনো মানে হয় ? নিচের রেস্তোরাঁয় চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

আজ বন্দর এলাকা দেখতে ইচ্ছে করছিল। বাজার ছাড়িয়ে একটু পুবে এগিয়ে গেলে ডক। অসংখ্য জেটি। তেমনি ছোট বড় জাহাজ। কোনো-কোনো জেটিতে সার সার মোটরবোট, লঞ্চ, স্টিমারও রয়েছে। লোকজন সে-তুলনায় কমই।

আজ বিকেলে আকাশ পরিষ্কার। সমুদ্রের জল রাঙা। নীল টুপিপরা নাবিকরা হল্লা করছে। একটা জেটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। সেখানে একটা ছোট্ট জাহাজ—যাকে স্কুনার বলা হয়, ভিড়ে রয়েছে। সংকীর্ণ ডেকে চেয়ার পেতে বসে বেশ লম্বা চওড়া একটা লোক বই পড়ছিল। সে হঠাৎ ঘুরে আমাকে দেখতে পেল। একটু হেসে মাথাটা সম্ভাষণ সূচকভঙ্গীতে দোলাল। তখন ভদ্রতা করে আমি বললুম, 'গুড আফ্টারনুন মিস্টার!'

লোকটা রাজাকোর মতোই দেখছি গায়ে পড়া। সম্ভাষণের প্রত্যুত্তর দিয়ে সে রেলিংয়ে ভর করে দাঁড়াল। বলল, 'মশাই স্থানীয় লোক নন নিশ্চয় ?'

'না। আমি ভারতীয়।'

'নিশ্চয় ব্যবসায়ী ?'

'না। পর্যটন।'

'আমার নাম ক্যারিবো। মশায়ের নাম ?'

ছোট্ট ডেকে বসে চা খেতে খেতে তার সঙ্গে গল্প করছি, পেছনের কেবিন থেকে কেউ বেরিয়েই আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। প্রচণ্ড চমকে উঠলুম। আরে! এ তো সেই রোমিলার কর্মচারী প্রিয়বর্ধন!

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'আপনি প্রিয়বর্ধন না ? রোমিলার বাড়িতে আপনাকে দেখেছি।'

প্রিয়বর্ধন খিকখিক করে হাসল। 'কে প্রিয়বর্ধন ? আমার নাম আানখুপা পিদ্রু।'

ক্যারিবো ভুরু কুঁচকে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। বললুম, 'আশ্চর্য তো ?

ক্যারিবো একটু হাসল! 'চেহারার এমন মিল হতেই পারে। একবার চীনে গিয়ে সব চীনাকে আমার একই লোক মনে হত।'

কিন্তু এ ভুল আমার হতেই পারে না। জেদ করে বললুম, 'না মিঃ ক্যারিবো! ইনি তিনিই বটে। কারণ মিঃ রাজাকোর বাড়িতে আজ সকালে এঁকে দেখেছি। একটু আগে শুনলুম, উনি নিপাত্তা হয়েছেন...'

আমার কথা শেষ হবার আগেই প্রিয়বর্ধন আমার ওপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি এর জন্য তৈরি ছিলুম না! শক্ত ডেকের ওপর বেকায়দায় পড়ে গেলুম। প্রিয়বর্ধন আমার বুকে বসে চেঁচিয়ে উঠল, 'ক্যারিবো! এ ব্যাটা সরকারি গুপ্তচর। এর মুখ বন্ধ করতে হবে। শিগগির!'

ক্যারিবো চাপা গলায় কাদের ডাকল। আমি যথাসাধ্য লড়ে যাচ্ছি, কিন্তু আরও দুজন বেঁটে হিংস্র চেহারার লোক কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। ক্যারিবো বিকৃত মুখে বলল, 'একে বেঁধে নিচে নিয়ে এস।'

নাইলনের মজবুত দড়িতে আমাকে ওরা আস্টেপিস্টে বেঁধে ফেলল। তারপর ধরাধরি করে সিঁড়ি বেয়ে জাহাজের খোলে নিয়ে গেল। নিচের কেবিনে পাটাতনের ওপর আমাকে ফেলে ক্যারিবো আমার পেটে জুতোসুদ্ধ একটা পা চাপিয়ে নিষ্ঠুর হেসে বলল, 'তা হলে তুমি সরকারি ঘুঘু ? বোসো, দেখাচ্ছি মজা।'

তারপর সে পকেট থেকে কী একটা বের করল। দেখেই আতঙ্কে কাঠ হয়ে গেলুম। ক্যারিবোর হাতে একটা চকচকে বাঁকা ছুরি।... [ক্রমশ:]

প্রাণী-বিচিত্রা

শৈল চক্রবর্তী

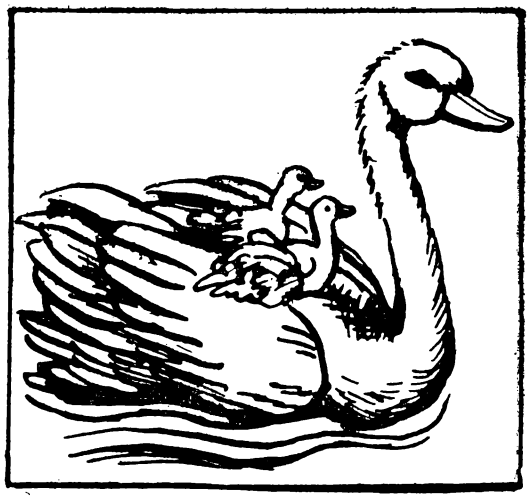

বাচ্চা কোয়ালা বড্ড বায়না-বাজ। সে ধরে বসল মাম্মী আমি যাব তোমার সঙ্গে। কোয়ালা মাম্মী আর কি করে, সে'ত কোলে নিতে পারে না, নিজের পিঠের গদির মতটেসী তাকে বসিয়ে নিল। তারপর এখান সেখান এমন কি গাছের গা বেয়ে তর তর করে উঠে গেল ওপরে। আর রাজহাঁসও কম যায় না। সেও বাচ্চাদের বায়না রাখতে নিজের গদী-আঁটা পিঠে চড়িয়ে জাহাজের মত চলল।

চিকে গোল্লা খেলা

সুধীর চক্রবর্তী

চিকে গোল্লা অর্থাৎ কাটাকুটি খেলা কারও অজানা নয়। আমি সেই খেলারই একটা বিশেষ রূপ নিয়ে আলোচনা করব। তার আগে এক মহিলা গণিতবিদের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

Ada Lovelace 1852 সালে মাত্র 36 বছর বয়সে ক্যানসার রোগে মারা যান। তিনি 10 ডিসেম্বর 1815 সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা অ্যানাবেলা লর্ড বায়রনকে বিবাহ করেন যে বিবাহ এক বছরের কিছু বেশি স্থায়ী ছিল—সে সময় আদা লাভলেসের জন্ম হয়।

আদা বায়রন 19 বছর বয়সে উইলিয়াম লর্ড কিং-কে বিবাহ করেন অল্পদিনের মধ্যেই যিনি Earl of Lovelace হয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই আদা বায়রন লাভলেসের অঙ্কে দারুন মাথা। যদিও অঙ্কশাস্ত্রে যুগান্তকারী কিছু করতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর কাজ নিয়ে আজ কম্পিউটরে পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে।

এবারে খেলার কথায় আসি। এই খেলাটি মূলত Mark Spikell-এর প্রস্তাবিত। Ada Lovelace এই খেলা এবং এরকম আরও অনেক বিষয়ের অঙ্ক নিয়ে গবেষণা করেন।

নিচের ছবিতে একটি বড় বর্গঘরকে $3 \times 3 = 9$টি সমান বর্গ ঘরে ভাগ করা হয়েছে। ওটিই খেলার বোর্ড। এখানে তিনটে সারি, তিনটে স্তম্ভ এবং মোট কর্ণ (অন্ততঃ কোণাকুণি দুটো ঘর) আছে 6টা। কর্ণগুলি ডটেড লাইন দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

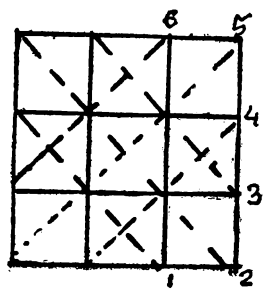

খেলোয়াড়ের সংখ্যা 2 জন। পর্যায়ক্রমে একজন চিকে (×), অন্যজন গোল্লা (o) বসিয়ে ঘরগুলির দখল নেবে।

পয়েন্ট গণনা ঃ

যখন কোন খেলোয়াড় তার দানে একটি লাইন সম্পূর্ণ করবে (এক চালে একাধিক লাইন নম্পূর্ণ হয়ে যেতে পারে) তখন সেই লাইনের মোট ঘর সংখ্যা (অন্ততপক্ষে দুটো) হবে তার পয়েন্ট। $3 \times 3 = 9$ সাইজের বোর্ডে মোট লাইন আছে, 12টা। তিনটে তিন ঘরের সারি, তিনটে তিন ঘরের স্তম্ভ, দুটো তিন ঘরের কর্ণ, চারটে দু' ঘরের কর্ণ। যদি একটি চালে দুই বা তিনটে লাইন সম্পূর্ণ হয়ে যায় তা হলে দুই বা তিন লাইনের বর্গঘরের সংখ্যা (যে ঘরে চিহ্ন বসানো হয়েছে সেটা দু'বার বা তিন বার ধরা হবে) হবে তার পয়েন্ট।

একটি খেলার নমুনা চিত্র সহযোগে দেখানো হলো। মনে করি খেলোয়াড়দের নাম ক এবং খ। ক চিকে (×) এবং খ গোল্লা (o) দেয়। ক-এর প্রথম চাল। বলা বাহুল্য মোট চাল 9টা। এক দানে ন্যূনতম পয়েন্ট 2 সর্বাধিক পয়েন্ট 9।

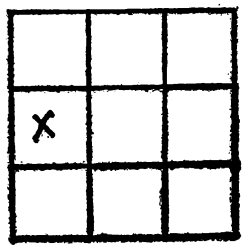

ক (×) খ (o)
o o

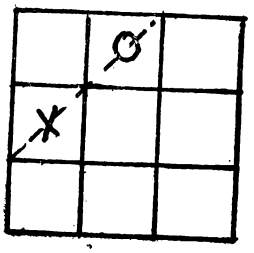

খ একটি দু' ঘরের কর্ণ সম্পূর্ণ করেছে 2--0

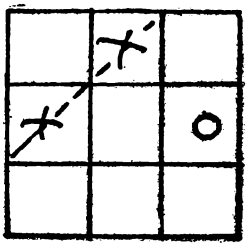

ক একটি দু' ঘরের কর্ণ সম্পূর্ণ করেছে 2—2

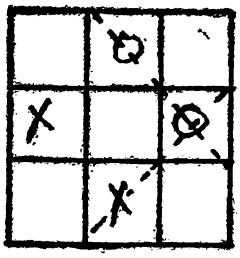

খ দুটো দু' ঘরের কর্ণ সম্পূর্ণ করে 2+2=4 পয়েণ্ট পেল 2—6

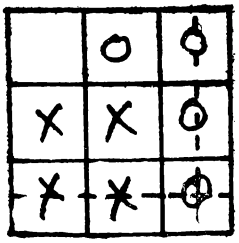

খ একটি সারি ও একটি স্তম্ভ সম্পূর্ণ করে 3+3=6 পয়েণ্ট পেল 11—12

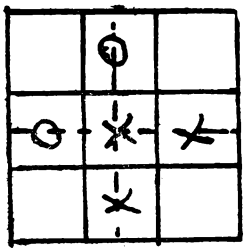

পয়েণ্টস
ক (×) — খ (0)

ক একটি সারি ও একটি স্তম্ভ সম্পূর্ণ করে 3+3=6 পয়েণ্ট পেল। 8—6

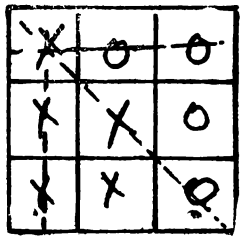

ক একটি সারি, একটি স্তম্ভ, একটি তিন ঘরের কর্ণ সম্পূর্ণ করে 9 পয়েণ্ট পেল 20—12

নিচে একটি তালিকা দেওয়া হলো ঃ

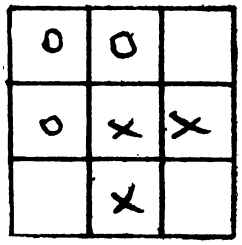

পয়েণ্ট যা ছিল তাই থাকবে। 8—6

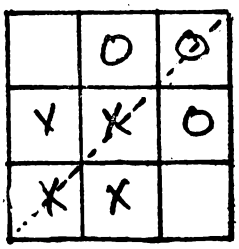

ক একটি তিন ঘরের কর্ণ সম্পূর্ণ করেছে 11—6

হয় তা হলে মোট পয়েণ্ট হবে $4n^2-4$ বোর্ডের সাইজ বড় করে খেলোয়াড়ের সংখ্যা বাড়ানো যায়। সেক্ষেত্রে এক একজন এক এক রঙের পেনসিল ব্যবহার করবে। চিহ্ন সবাই একইরকম দিলেও অসুবিধা হবে না, অথবা ভিন্ন রঙের ঘুঁটিও ব্যবহার করতে পারে।

এই খেলাতে ঘরসংখ্যা বাড়ানো যায়। যেমন $4\times4=16$ ঘর কিম্বা $5\times5=25$ ঘরের বোর্ড। হিসেব করলে দেখা যায় যতভাবেই খেলা হোক না কেন মোট পয়েণ্ট সর্বদা সমান থাকে। যেমন $3\times3=9$ ঘরের খেলায় মোট পয়েণ্ট হবে 32। $4\times4=16$ ঘরের খেলায় মোট পয়েণ্ট হবে 60। এর একটা সূত্র আছে (Ada Lovelace বার করেন) যদি ঘরের সংখ্যা $n\times n=n^2$

* অর্থাৎ 4টে 2 ঘরের, 4টে তিন ঘরের, 4টে চার ঘরের, 4টে পাঁচ ঘরের এবং দুটো দু' ঘরের কর্ণ।

এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা ঃ $3\times3=9$ ঘরের খেলায় দু'জনে খেললে একজন খেলোয়াড় কম দান পায়। কাজেই বোর্ড অনুযায়ী খেলোয়াড়ের সংখ্যা এমন হওয়া উচিত যাতে সবাই সমান চাল পায়। যেমন $6\times6=$ 36 সাইজের বোর্ডের খেলায় খেলোয়াড়ের সংখ্যা 2, 3, 4, 6 হতে পারে। প্রত্যেকে যথাক্রমে 18, 12, 9, 6টা চাল পাবে এবং যথাক্রমে 18টা দু' রঙের, 12টা তিন রঙের, 6টা চার রঙের/6টা 6 রঙের ঘুঁটি লাগবে।

82/1 রায় বাহাদুর রোড, কলি-34

জান্তব জ্বালানি

জীমূতকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের দিনে পৃথিবীতে যে দুটি বড় সমস্যা মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে তা হচ্ছে পরিবেশদূষণ ও জ্বালানি সংকট।

দেখা গেছে, সারা বিশ্বে জীবাশ্মজাত তেল বা 'ফসিল অয়েল' পেট্রোলিয়াম, কয়লা গ্যাস ইত্যাদির সঞ্চয় খুব শীগগিরই শেষ হয়ে আসছে। তাই জ্বালানি হিসেবে তরল সোনার সীমিত ব্যবহার বা রেশনিং-এর কথা ইতিমধ্যেই বেশ চালু হয়ে গেছে।

জ্বালানি সংকটের সঙ্গে মিলেছে এসে পেট্রোল মোবিল ডিজেল কোল গ্যাস ইত্যাদি অনবরত পোড়ানোর দরুন বিশেষ করে, মোটরগাড়ি রেল ইঞ্জিন ও কলকারখানার দ্বারা আবহাওয়া ও পরিবেশ কলুষিত ও দূষিত হওয়ার ক্রমবর্ধমান সমস্যা।

আজ সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীকুল এ নিয়ে ভাবিত। নানা জনে নানা প্রতিকারের উপায়ের কথা ভাবছেন। এঁদের অন্যতম হচ্ছেন ব্রিটেনের গ্রাস ডেভনের পঁয়ষট্টি বছর বয়স্ক ইঞ্জিনীয়ার মিঃ হ্যারল্ড্ বেট। পূর্বোক্ত দুই বৃহৎ বিশ্বসমস্যার আংশিক সমাধানে ইনি একটি উপায় ভেবে স্থির করেছেন।

এঁর মতে পেট্রোলিয়ামের অভাবে বিকল্প জ্বালানি বা তেলের জন্য চিন্তা ও উদ্বেগের এখন পর্যন্ত তেমন কোন কারণ ঘটে নি, যেহেতু, যন্ত্র ও কলকারখানার পেট্রোলের বিকল্প বস্তু হিসেবে আরো কয়েকটি জিনিসের মতো জীবজন্তুর মলমূত্রও সচ্ছন্দে ব্যবহার করা চলতে পারে। প্রকৃতির জন্যে এ জিনিস তো এখনো প্রায় ঈফুরন্ত। এটা শুধু তাঁর মতবাদ বা থিয়োরি'ই নয়। বাস্তবেও ইনি হাতেকলমে এর সুষ্ঠু ও সফল প্রয়োগ দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য আমরা ইতিমধ্যে আমাদের দেশের বায়োগ্যাস তথা গোবর গ্যাস সহজলভ্য সস্তা জ্বালানিরূপে কাজে লাগাতে পেরেছি।

তিনি একটি যন্ত্র তৈরি করেছেন যার নাম, অটোগ্যাস কনভার্টার। এটি তিনি তাঁর নিজস্ব মোটরগাড়িতে ব্যবহার করছেন। এর সাহায্যে গাড়ি চালিয়ে তিনি ডাটমাউথ ডেভন থেকে সাড়ে তিনশো মাইল দূরত্বে লণ্ডনে পৌঁছান ঘণ্টায় আটাত্তর মাইল বেগে গাড়ি চালিয়ে। মাত্র সাড়ে চার ঘণ্টা সময়ে।

মিঃ বেট আবিষ্কৃত এই জান্তব-জ্বালানি নাকি খুব উচ্চ শক্তিসম্পন্ন—প্রায় একশো সাতাশ অক্টেন। যেক্ষেত্রে সাধারণ মোটরগাড়িতে ব্যবহৃত পেট্রোল হচ্ছে মাত্র একশো অকটেন শক্তিসম্পন্ন। এই জ্বালানি জান্তব মলমূত্র জাত হলেও কিন্তু প্রায় বর্ণ ও দুর্গন্ধহীন। এই জাতীয় জ্বালানির প্রতি গ্যালনে তিরিশ মাইল গাড়ি চালানো যায়, আর খরচাও এতে অবিশ্বাস্য রকমের কম। প্রতি গ্যালন জান্তব জ্বালানি তৈরিতে খরচা গড়ে মোটে দু পেন্স মানে প্রায় পঁয়ত্রিশ পয়সা।

মিঃ বেট বলেন, যে কোন জৈবিক বাহ্য থেকেই তাঁর যন্ত্রে মিথেন গ্যাস তৈরি করা সম্ভব, যা কোন আভ্যন্তরীণ দহন যন্ত্রে ইণ্টারনাল কমবাসশন ইঞ্জিন) ব্যবহার করা যাবে। এর দহনক্রিয়ার দরুন পেট্রোল বা ডিজেলের তুলনায় আবহাওয়া দূষিত হয় নগণ্য রকমের কম। ফলে বিশ্বজোড়া পরিবেশদূষণসমস্যার সমাধানে এটি নিঃসন্দেহে একটি অগ্রবর্তী পদক্ষেপ।

জিনিসটা কিভাবে তৈরি হয়? মিঃ বেট অবশ্য এখন অবধি কেবল হাঁস মুরগি ও শূয়োরের দেহ নিষ্ক্রান্ত বাহ্য বস্তু অর্থাৎ মলমূত্র ব্যবহার করেছেন পরীক্ষা-মূলকভাবে, যেহেতু এটাই এখন তাঁর কাছে সর্বাধিক সহজলভ্য। কিন্তু তিনি বলেন, যে কোন জীবজন্তুর মলমূত্র থেকেই এই জাতের জ্বালানি প্রস্তুতের কাজ চলবে। অবশ্য মানুষের মলমূত্র নাকি এ কাজে আদৌ তেমন উপযুক্ত নয়। কারণ মানুষের খাবারে থাকে নানা জটিল রাসায়নিক যৌগের আধিক্য—যা মলমূত্রতেও শেষ অবধি বজায় থাকে ও তা থেকে ব্যাকটিরিয়া সহযোগে মিথেন গ্যাস নিষ্কাশনপ্রক্রিয়ায় অন্তরায় হয়ে দেখা দেয়। তবে মানুষের মলমূত্র জমির সার হতে পারে। যে প্রক্রিয়ায় জান্তব মলমূত্রাদিকে জ্বালানিতে পরিণত করা হয় তা হচ্ছে এই ঃ

প্রথমে সংগৃহীত মলমূত্রকে একটি ধাতব নলের ভেতরে রাখা হয়! তার সঙ্গে কিছুটা জল ও খানিকটা খড়কুটোও মেশানো চলে। তারপর এই মিশ্রণটিকে পাতন পদ্ধতিতে পরিশ্রুত করা হয় ও জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগানোর উপযুক্ত করে তোলা হয়। মোটামুটিভাবে এইটুকুই হচ্ছে গোটা পদ্ধতিটির মূল সূত্র। এর সঙ্গে দরকার সামান্য পরিমাণে প্যারাফিন যা মিশ্রণটিকে তার যথার্থ রূপদানে আরো সহায়তা করে।

প্রায় পঁচাত্তর ডিগ্রি (সেঃ) পরিমাণ উত্তাপের এক শ্রেণীর ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে, এই মিশ্রণ থেকে দাহ্য গ্যাস

তৈরী হয়। গ্যাস প্রস্তুত হবার পর সেটাকে সঙ্কুচিত করে ছোট ছোট নলের ভেতর রাখা হয়।

এই নল বা সিলিণ্ডারগুলি গাড়ির পেছনের প্রকোষ্ঠে রাখা হয়। সরু সরু নলের সাহায্যে এই সিলিণ্ডারগুলি যুক্ত হয়েছে কনভার্টার বা রূপান্তরণ যন্ত্রের সঙ্গে।

এই কনভার্টার যন্ত্র মারফৎ কাবুরেটারের সাহায্যে গ্যাস শোষিত হয়ে চলে যায় গাড়ির ইঞ্জিনে। এই কনভার্টার দরকার মত অন্য গাড়িতেও খুলে এনে বসানো যায়। কার্বুরেটার পরিবর্তন করতে হয় না বলে গাড়ি দরকার মত সাবেক পেট্রোল বা তৎপরিবর্তে পূর্বোক্ত জান্তব মিথেন গ্যাস উভয়েতেই চালানো যায়।

জীবজন্তুর মলমূত্র থেকে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়া শুধু যে উচ্চ দাহিকাশক্তিসম্পন্ন জ্বালানি তৈরি হয় তাই নয়, পাতন প্রক্রিয়ার শেষে যে সব তলানি পড়ে থাকে তা থেকে তৈরি করা গেছে হুইস্কি জাতীয় মদ, ও তামাকের এক বিকল্প বস্তু যা ধূমপানের অনিষ্টকারকতা অনেকাংশেই হ্রাস করতে পারে।

তা ছাড়া, আর একটা মস্ত সুখবর টেকো মাথায় চুল গজাবার মতো কিছু দুর্লভ কেশবর্ধক ক্ষমতাও নাকি এই বস্তুতে পাওয়া গেছে।

নিজ পরীক্ষাগারে উপরোক্ত জান্তব জ্বালানি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার সময় মিঃ বেট-এর হাতে নাকি ঐ জান্তব জ্বালানির খানিকটা তলানি দৈবাৎ লেগে গিয়েছিল বকযন্ত্র থেকে চুঁইয়ে পড়ে।

ফলে কদিন বাদে তিনি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর হাতে অস্বাভাবিকভাবে লোম গজিয়ে চলেছে। এ ছাড়া, চাষাবাদের জন্যে জমির সার হিসেবে জীবজন্তুর মলমূত্রের প্রয়োজনীয়তা সর্বত্রই পরিচিত ও স্বীকৃত।

গবাদি পশুর মলমূত্র, বিশেষ করে গোময় বা গোবর ও গোরোচনা বা গোমূত্র তো রোগসংক্রমণ নিবারকরূপে আমাদের আয়ুর্বেদশাস্ত্রেও বহু প্রাচীনকাল থেকেই স্বীকৃত। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান মতেও তা জীবাণুনাশক বলে প্রমাণিত।

ভাবতে অবাক লাগে, আধুনিক বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উন্নতির কত আগে হাজার হাজার বছর পূর্বে প্রাচীন ভারতীয় মুনিঋষিগণ গোময় ও গোমূত্রকে মানুষের পরম উপকারী সম্পদরূপে চিনতে পেরে এদের মহাসমাদরে ঠাঁই দিয়েছিলেন গৃহের প্রাঙ্গণে প্রাচীরে কক্ষতলে সর্বত্র—এমন কি দেবস্থানে পূজার্চনার অপরিহার্য উপকরণরূপে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, এ সংসারে অনেক আপাত তুচ্ছ ও ঘৃণ্য বস্তুই আসলে বর্ণচোরা আম—মানুষের পক্ষে ছদ্মবেশী আশীর্বাদস্বরূপ।

---

20 দমদম রোড, কলিকাতা-30

যন্ত্র যখন সাড়া দেয়

সলিল মিত্র

চতুষ্পদ যন্ত্রমানব

চতুষ্পদ মানব হয় কি করে? যন্ত্রে অবশ্য হয়! সেই যন্ত্রমানবের কথাই বলি। এই যন্ত্রমানবটি নিউইয়র্কে বসবাস করে! মিউজিয়ম অফ মডার্ন আর্ট-এর একখানি চেয়ার সে দখল করে থাকে সব সময়। তার কাজ হলো, কেউ কিছু প্রশ্ন জিগ্যেস করলে তার জবাব দেওয়া। একের পর এক জবাব দিতে দিতে সে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন তার ক্লান্তি দূর করতে চেয়ারখানা তাকে নিয়ে দুলতে থাকে। এই দোলনের ফলে যন্ত্রমানবের নতুন করে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারে অবশ্য মতামত জানিয়েছেন যন্ত্রমানবের উদ্ভাবক স্বয়ং।

যন্ত্রমানব পারসেপট্রন

ডঃ ফ্রাঙ্ক রজেন্ট ব্লাণ্ট হলেন নিউইয়র্কের রিসার্চ সাইকোলজিস্ট। তিনি পারসেপট্রন যন্ত্রমানবের সৃষ্টিকর্তা। পারসেপট্রন অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি। তার গুণের সীমা নেই। লেখাপড়া করা, সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে কথায় উত্তর দেওয়া, অনুবাদের কাজকর্ম—সবই করতে পারে পারসেপট্রন। শুধু তাই নয়, অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যও সে তার গবেষকদের কাছে সংগ্রহ করে আনে।

জ্যোতিষী ব্যক্তি 'এ্যাসট্রোফ্লাস'

'এ্যাসট্রোফ্লাস'কে জ্যোতিষী ব্যক্তি বলা হলেও এটা একটা কমপিউটর। এটি আছে প্যারিসের সাঁজ এলিজেতে। ফরাসী মুদ্রা 20 ফ্রাঁ-র বিনিময়ে, আগামী ছ'টা মাস কেমন যাবে এ বলে দিতে পারে। নিজের জন্মের সঠিক তারিখ আর জন্মস্থান জানিয়ে দিলে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে টাইপ করা ঠিকুজি যাতে থাকবে ছ'মাসের ভবিষ্যৎ।

নটিলাস ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে দক্ষিণে। অতিবাহিত হল কয়েকটা দিন। সমুদ্রবক্ষে এবার শুরু হল বরফ খণ্ডের বিস্তার।
কী অপূর্ব দৃশ্যপট! কেমন করে এ আমি ভাষায় ধরে রাখি!
তুষার রাজ্যের এক সঙ্কীর্ণ পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছিল নটিলাস। চারদিকের জল জমে তার গতিরুদ্ধ হল।
আমরা বন্দী হলাম ক্যাপ্টেন।
এবার নামতে হবে নীচে, তুষার স্তরের গভীরে জলের সন্ধান ঠিক পাবো। দেখবেন সব বাধা অতিক্রম করে আমরা পৌঁছে যাবো একেবারে দক্ষিণ মেরুতে।
সৌভিক কর্মকার
চার পাশের বরফ কিছুটা পরিষ্কার করার পর নটিলাস ডুব দিল গভীরে। ন-শ ফুট নীচে স্বচ্ছন্দে সাঁতার কাটার মতো জল পাওয়া গেল।
ঘন্টায় চব্বিশ মাইল বেগে ধেয়ে চলেছে নটিলাস; গতি যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তবে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছতে আর দেরী নেই।
৭৯

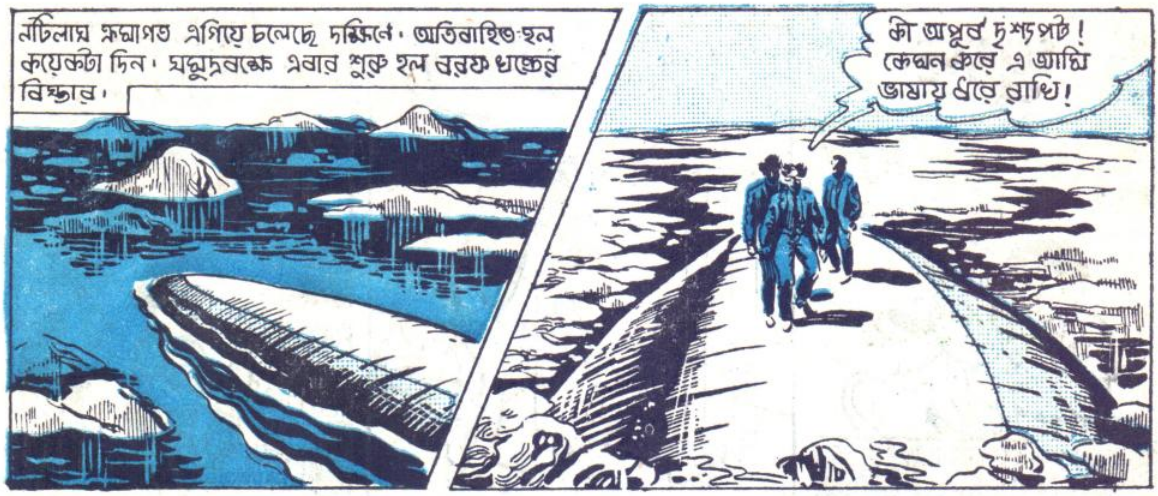

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

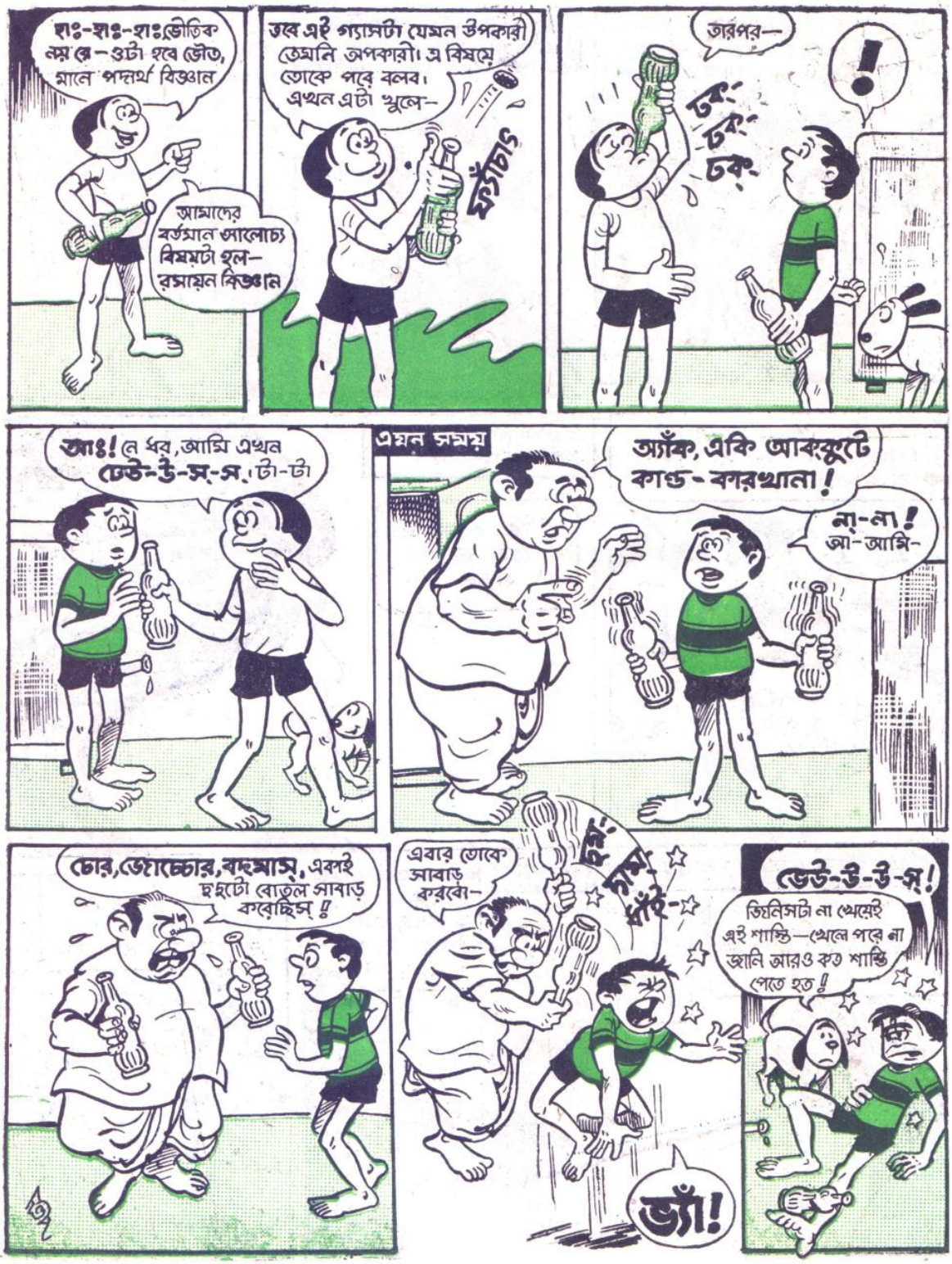

হাঃ-হাঃ-হাঃ ভৌতিক নয় রে—ওটা হবে ভৌত, মানে পদার্থ বিজ্ঞান
আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়টা হল—রসায়ন বিজ্ঞান
তবে এই গ্যাসটা যেমন উপকারী তেমনি অপকারী। এ বিষয়ে তোকে পরে বলব। এখন এটা খুলে—
ফঁ্যাচাং
তারপর—
ঢক্-ঢক্-ঢক্-ঢক্
!
আঃ! নে ধর, আমি এখন ঢেউ-উ-স্-স্। টা-টা
এমন সময়
অ্যাঁক, একি আক্কুটে কাণ্ড-কারখানা!
না-না! আ-আমি-
চোর, জোচ্চোর, বদমাস্, একাই দু'দুটো বোতল সাবাড় করেছিস্!
এবার তোকে সাবাড় করবো—
ভ্যাঁ!
ঢেউ-উ-উ-স্!
জিনিসটা না খেয়েই এই শাস্তি—খেলে পরে না জানি আরও কত শাস্তি পেতে হত!

প্যারিস থেকে লণ্ডনে এলেন জগদীশচন্দ্র। এখানে রয়াল ইন্‌স্টিটিউশনে তাঁর নতুন আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে আহূত হলেন। সঙ্গী হলেন বসু জায়া অবলা দেবী

সহজ সরল এবং সাবলীল ভাষায় শুরু করলেন তাঁর বক্তৃতা

দেখালেন জীব ও জড় পদার্থের স্পন্দন লিপি

আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা বহু পূর্বেই এ সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন। আমি শুধু তা প্রমাণ করে দেখালুম

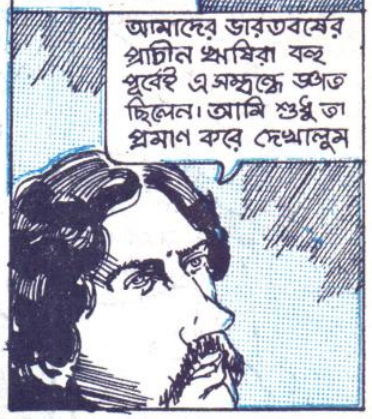

ভারতীয় বিজ্ঞানীর এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার সমবেত বিশিষ্ট দর্শক-মণ্ডলী সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করলেন।

প্রত্যক্ষ করলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ।

ধন্য তুমি ভারত-মাতা, ধন্য তোমার সুযোগ্য সন্তান

বিস্মিত হলেন সমবেত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী

এ তিনটি গ্রাফ'ত দেখছি একই রকম এবং গুলো সবই মাংসপেশী সংকোচনের তাই না মিঃ বোস ?

ঠিক ধরেছেন। তবে এর একটা হল ব্যাঙের, দ্বিতীয়টি হল লতার, তৃতীয়টি হল এক টুকরো টিনের—

অ্যাঁ, বলেন কি! মিঃ বোস এযে একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার !

অবিশ্বাস্য হলেও এ যে সত্য তার প্রমাণ তো আপনারা চাক্ষুষ দেখলেন

প্রত্যাবর্তন

মঞ্জিল সেন

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আমি বললাম, 'এবার বলুন, কি আপনার এত জরুরী কথা।'

'আপনাকে এই অসময়ে বিরক্ত করলাম বলে আমি সত্যিই দুঃখিত, ডঃ মজুমদার,' প্রফেসর বোস ক্ষমা চাইবার ভঙ্গীতে বললেন, 'কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে ভীষণ একটা সমস্যা, আবার সবার কাছে বলাও যায় না। তবে আগেই আমি বলে রাখছি, সব শুনে আপনি আমাকে পাগল ভাববেন না।'

আমি কফির পেয়ালা নামিয়ে রেখে বললাম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আপনার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তা ছাড়া বড় বড় বিজ্ঞানীরা চিরকালই একটু খামখেয়ালী হয়ে থাকেন।'

প্রফেসর বোস এক চুমুকে অবশিষ্ট কফি নিঃশেষ করলেন, তারপর সামান্য ইতস্তত করে বললেন, 'আমি যা বলব তা খুব গোপনীয়, ব্যক্তিগত তো বটেই। আমি কি আশা করতে পারি আপনি দ্বিতীয় কারো কাছে এ কথা বলবেন না?'

'নিশ্চয়ই' আমি একটু রহস্যের সন্ধান পেয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠলাম, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ইওর সিক্রেট উইল বি সেফ্ উইথ মী।'

প্রফেসর বললেন, 'আমি তিরিশ বছর আগের জীবনে ফিরে যেতে চাই।'

'কি বললেন!' আমি নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না।

প্রফেসর বোস মৃদু হাসলেন। বললেন, 'আপনাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছি. আমাকে পাগল ভাববেন না।' তারপরই গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনি আমার ল্যাবে পোস্ট বক্সের মতো ওই যন্ত্রটা দেখে অনেক দিনই ঠাট্টা করেছেন। আজ আপনাকে খুলেই বলি, ওটা আসলে এইচ. জি. ওয়েলস যে টাইম মেশিনের কথা

লিখে গেছেন, তারই একটা উন্নত সংস্করণ। লক্ষ্য করে দেখেছেন বোধ হয় ওটা মাথায় প্রায় ছ'ফুট, চারপাশ ঘেরা, মাথাটাও অনেকটা লেটার বক্সের মতো। কিন্তু ওটার একটা দরজা আছে, তা দিয়ে ভেতরে ঢোকা যায়। ভেতরটা অপরিসর হলেও একজনের নড়াচড়ার পক্ষে যথেষ্ট। ভেতরে আছে জটিল সব যন্ত্রপাতি। একটা মেন্ সুইচও আছে, ওটা অন্ করলেই মেশিন চালু হয়ে যাবে। তখন আপনি ইচ্ছে মত সময়ে চলে যেতে পারেন। যেমন বাঁ দিকের হলুদ বোতাম টিপলে আপনি ফেলে আসা নির্দিষ্ট একটা বছরে ফিরে যাবেন। সময়টা পাঁচ, দশ, কুড়ি করে একশ পর্যন্ত ভাগ করা আছে। অর্থাৎ আপনি পঞ্চাশ বছর আগের জীবনে ফিরে যেতে চাইলে বাঁ দিকের মাইনাস পঞ্চাশ চিহ্নিত বোতাম টিপবেন। তেমনি ডান দিকের লাল রঙের প্লাস পঞ্চাশ চিহ্নিত বোতাম টিপে আপনি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে যে পরিবেশ হবে বা যে সব ঘটনা ঘটতে পারে সেখানে পৌঁছে যাবেন।'

'আপনি আমার সঙ্গে তামাশা করছেন না তো?' আমি ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলাম।

'না, ডঃ মজুমদার, আপনার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটিয়ে আপনার সঙ্গে তামাশা করতে আসার মতো মতিভ্রম আমার হয় নি,' প্রফেসর বোস সামান্য আহত কণ্ঠে জবাব দিলেন. 'বহু দিনের সাধনায়, বহু পরিশ্রমে এই যন্ত্র আমি বানিয়েছি। এটা জানাজানি হয়ে গেলে একটা হৈ হৈ পড়ে যাবে এই ভয়ে এতদিন কাউকে আমার গবেষণা কিংবা চূড়ান্ত আবিষ্কারের কথা বলিনি। আপনিই প্রথম, যাঁকে আমি বিশ্বাস করে বললাম।'

'আপনার বিশ্বাসের জন্য ধন্যবাদ,' আমি ঢোক গিলে বললাম, 'কিন্তু ব্যাপারটা এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'ভুলে যাবেন না, আমরা আজ বিজ্ঞানচর্চায় অনেক এগিয়ে গেছি, অনেক কিছুই যা ছিল কল্পনায় আজ তা বাস্তব।'

'কিন্তু আপনি এমন একটা আবিষ্কার গোপন রাখতে চাইছেন কেন?' আমি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'মানুষ অমর হলে পৃথিবীতে যে মহাসঙ্কট দেখা দেবে, এই যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া তার চাইতে কম নয়,' প্রফেসর জবাব দিলেন, 'একজন বিজ্ঞানী হিসাবে তা আমি হতে দিতে পারি না। তা ছাড়া,' একটু থেমে তিনি বললেন, 'আপনাকে বলতে বাধা নেই, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সারা জীবনের চেষ্টায় আমি এই যন্ত্র বানিয়েছি। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিই আমার উদ্দেশ্য।'

'সেটা আমি জানতে পারি কি?' আমি আবার কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

'হ্যাঁ, সেজন্যেই তো আপনার কাছে আসা,' প্রফেসর সোজা হয়ে বসলেন। 'আমি জীবনে মস্ত একটা ভুল করেছি···আমি অতীতে ফিরে গিয়ে সেই ভুলের সংশোধন করতে চাই।'

আমি হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে তিনি বললেন, 'ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলি। তিরিশ বছর আগে যে সময়ে এবং যে পরিবেশে আমি ছিলাম, এই যন্ত্রের সাহায্যে আমি সে অবস্থায় ফিরে যাব। তারপর যে ঘটনাগুলো তখন ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে। কিন্তু আমি এবার সজাগ থাকব। ভুল সিদ্ধান্ত আর নেব না।'

'কিন্তু আপনি তিরিশ বছর আগের জীবনে ফিরে গেলে তখনকার ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়বেন,' আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম, 'এখন যেমন আপনি জানেন অতীতে কি ভুল করেছিলেন, তখন তা আগে থেকে জানবার অবকাশ থাকবে না।'

'ঠিকই বলেছেন,' প্রফেসর জবাব দিলেন, 'এ প্রশ্ন আমার মনে যে জাগে নি তা নয়। সে কথা ভেবেই আমি আমার যন্ত্রের মধ্যে একটা কম্প্যুটার মগজ বসিয়েছি। আমি আগের জীবনে ফিরে গেলে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত নেবার ঠিক আগে ওটা আমার মগজের কোষে একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ তুলে আমাকে বর্তমানের কথা মনে করিয়ে দেবে। অবশ্য অতীতের কথা ভেবেই আমি ওটা করেছি, আগামীকালে ওটা শুধু একজনকে তার ভুল সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না।'

'সেটা কি করে সম্ভব হবে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'তার মগজে একটা সাবধানতার অনুভূতি ফুটে উঠবে, যার ফলে সিদ্ধান্ত নেবার আগে দ্বিতীয়বার সে চিন্তা করার সুযোগ পাবে।'

'কিন্তু আপনি আবার বর্তমানে ফিরে আসবেন কেমন করে?' আমার কৌতূহল দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

'সেজন্যেই তো আপনার সাহায্য চাই,' প্রফেসর এবার হাসলেন স্বচ্ছ হাসি। 'মেশিনের মাথার কাছে একটা সবুজ চোখ আছে। আসলে ওটা একটা ইলেকট্রনিক বোতাম। আপনি ওটা টিপলেই আমি বর্তমানে ফিরে আসব।'

'কবে, কখন, বোতামটা টিপতে হবে আমি জানব কেমন করে?' আমি জিগ্যেস করলাম, 'আপনার কাজ যদি ততদিনে শেষ না হয়?'

'আমি হিসেব করে দেখেছি,' প্রফেসর বললেন, 'যে ঘটনা বা ভুলের সংশোধন আমি করতে যাচ্ছি তা ঘটেছিল আমার জীবনের কুড়ি বছর দু'মাস বয়সের মধ্যে। আজ আমার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। আমি তিরিশ বছর আগে ফিরে গেলে আমার কুড়ি বছর বয়স হবে। আপনি আজ থেকে দু'মাস পরে রাত দশটার সময় ওই বোতামটা টিপবেন।'

'একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না,' হঠাৎ একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগল, 'আপনি বলছেন মেশিনটা চালু করে মাইনাস বোতাম টিপলেই আপনি অতীতে ফিরে যাবেন। কিন্তু মেশিনটা আবার অচল কে করবে বা কিভাবে হবে?'

প্রফেসর বোস হাসলেন। তারপর বললেন, মেশিনটা এমনভাবে তৈরী যে প্রত্যেক অপারেশন বা ঘটনা ঘটবার পর ওটা আপনা থেকেই অচল হয়ে যাবে। আগেই বলেছি এটা খুব উন্নত ধরনের যন্ত্র।'

'বুঝলাম,' আমি বললাম, 'কিন্তু আপনি বর্তমানে ফিরে আসতে চাইছেন কেন? "আপনি আবার হারানো বছর-গুলো ফিরে পাবেন। নতুনভাবে জীবন শুরু করবেন।"

'না' প্রফেসর বোস দু'পাশে মাথা নাড়লেন, 'দীর্ঘ তিরিশ বছর আবার সেই একই ঘটনা একটার পর একটা ঘটতে থাকবে। আমার হয়তো ভুল আর হবে না, কিন্তু সে বড় ক্লান্তিকর, বৈচিত্র্যহীন···না, আমি সেই পুরনো জীবনে বরাবরের মতো ফিরে যেতে চাই না। দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার ইচ্ছেও খুব আমার নেই, সে বড় যন্ত্রণাময়···,' প্রফেসরের কথাগুলো শেষের দিকে কেমন যেন বেদনাতুর হয়ে উঠলো।

স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে ভদ্রলোকের মনে পর্বতপ্রমাণ যে ব্যথা তিলে তিলে জমে উঠেছিল, তারই সুর যেন বেজে উঠল তাঁর গলায়। আমি মনে মনে দুঃখ অনুভব করলাম। একজন সার্থক বিজ্ঞানী, অর্থের অভাব নেই, কিন্তু এই পৃথিবীতে ভদ্রলোক যেন নিঃসঙ্গ, বড় একা।

'আপনার প্রস্তাবে আমার আপত্তি নেই,' আমি প্রসঙ্গ বদলাবার জন্যে বললাম, অবশ্য আমার করণীয় সামান্যই, শুধুমাত্র আপনার ফ্ল্যাটে গিয়ে একটা সুইচ টেপা।' আমি হাসলাম।

প্রফেসরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি এগিয়ে এসে আমার দু'হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে গভীর আবেগে বললেন, 'আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার জন্যে এমন একজনের সাহায্য আমার দরকার যিনি শুধু বিজ্ঞই নন, সংবেদনশীল যাঁর মন, বিশেষ করে মেশিনটার গুরুত্ব বিবেচনা করে যাঁর ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখা যায়। সর্বদিক বিচার করে আপনার নামই আমার মনে হয়েছিল, ডঃ মজুমদার।'

'থ্যাঙ্কস ফর দ্য কম্‌প্লিমেণ্ট,' আমি মৃদু হাসলাম।

হরিধনের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল মৃগাঙ্কর, ধড়-মড় করে ও উঠে বসল।

হাসপাতাল থেকে খবর এয়েছে গো খোকাদাদা,' ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল হরিধন, 'বড়বাবু আর নেই।'

মৃগাঙ্ক যেন পাষাণ হয়ে গেল। গতকাল সন্ধ্যেবেলা বাবাকে ও দেখে এসেছে, তখন তো ভালই ছিলেন।

হঠাৎ এ কি হলো! ছোটবেলা মা মারা যাবার পর বাবাই ওর সব কিছু অভাব পূর্ণ করেছিলেন। আর বুক দিয়ে আগলে রয়েছে হরিদা, ওর জন্মের সময় অর্থাৎ কুড়ি বছর আগে যে মানুষটি এ বাড়িতে কাজে ঢুকেছিল।

পাশের বাড়ির উকিল কাকু এসে পড়লেন। তিনিই সব যোগাযোগ করলেন, মামাবাড়ির লোকজনও এসে পড়লেন।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল। বড় মামা মৃগাঙ্ককে তাঁদের ওখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, বড় মামীমা, মেজমামীমা সবাই অনেক করে বলেছিলেন। মাতৃহারা এই কিশোরের খুব আদর ছিল মামাবাড়িতে। তাছাড়া লেখাপড়ায় খুব ভাল, অঙ্কে দারুন মাথা, নম্র, বিনয়ী, ভাল না বেসে পারা যায় না।

মৃগাঙ্ক কিন্তু মামাবাড়ি গেল না। ওর হরিদাকে নিয়ে নিজেদের বাড়িতেই থাকবে ঠিক করলো। বাবার আপিস থেকে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি এসব বাবদ যা পাওয়া যাবে তা ফিক্সড্ ডিপোজিটে রেখে দিলে মাসে মাসে যে টাকা ওর হাতে আসবে তা দিয়ে ওদের দুটি প্রাণীর বেশ চলে যাবে। তা ছাড়া ব্যাঙ্কে বাবার জমানো টাকার অঙ্কও কম নয়। দরকার পড়লে বাড়ির একতলাটা ভাড়া দেওয়া যেতে পারে। ওর বড় মামাই সব ব্যবস্থা কর-ছিলেন। হঠাৎ তিনিও অসুখে পড়লেন।

পাশের বাড়ির উকিল কাকুও আসছিলেন, তিনি অনেকদিন এ বাড়ির সঙ্গে পরিচিত। মৃগাঙ্কর বাবার আইনঘটিত সব কাজ-কর্ম তিনিই করতেন। বড় মামা অসুস্থ হবার দিন কয়েক পরে তিনি একতাড়া কাগজ-পত্তর এনে মৃগাঙ্ককে বললেন, 'বাবা মৃগাঙ্ক, তোমার এখন অনেক কাজ, সাকশেসন সার্টিফিকেট নিতে হবে,

তা ছাড়া সব কিছু নিজের নামে করে নেওয়া দরকার। তুমি এই কাগজপত্তর সই করে দাও, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। বাজার হোক, আমারও তো তোমার প্রতি একটা কর্তব্য আছে।'

মৃগাঙ্ক বলল, 'সে তো ভাল কথা উকিল কাকু, আইনের জটিল ব্যাপার আমি কিছু বুঝিও না, আপনি নিজে থেকে সব করে দিচ্ছেন, আপনি কত ভাল '

'ছি ছি ওসব কথা বোল না,' উকিল কাকু গাঢ় স্বরে বললেন, 'তোমার বাবা আমার বন্ধু ছিলেন, এ সামান্য কাজটুকু আমি যদি না করি তবে লোকে আমাকে মন্দ বলবে।'

হরিধন ওখানে ছিল। সে কিছু একটা বলতে গিয়েছিল, কিন্তু মৃগাঙ্ক তাকে থামিয়ে কলমটা তুলে নিল, আর তখুনি ওর মাথার ভেতর যেন একটা তরঙ্গ খেলে গেল। আস্তে আস্তে মনে পড়ল ওর···

সেদিনও উকিল কাকু এভাবে ওকে দিয়ে কাগজপত্তর সই করিয়ে নিয়েছিলেন। সরল বিশ্বাসে ও সই করেছিল, মামাবাড়িতে বলার দরকারও মনে করে নি। হরিদা অবশ্য খুব রাগ করেছিল। তারপর সাতদিন যেতে না যেতেই উকিল কাকুর অন্য মূর্তি দেখে ও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। সকালেই উকিল কাকু এসেছিলেন, ওকে ডেকে বলেছিলেন, 'শোন মৃগাঙ্ক, এ বাড়ি তোমাকে যে ছেড়ে দিতে হবে।'

'সে কি!' মৃগাঙ্ক চমকে উঠেছিল।

'বাঃ তুমিই তো পঞ্চাশ হাজার টাকার বদলে বাড়িটা আমাকে বিক্রি করেছ। এর মধ্যেই ভুলে গেলে। সেদিন অতগুলো সই করলে।'

মৃগাঙ্কর মুখে কথা সরলো না। হরিধনই গলা তুলে বললো, "এ আপনি কি সব্বনেশে কথা বলতেছেন বাবু! ছেইলাটারে অসহায় দেখ্যে মিথ্যে সই করে বাড়িঘর নিজের নামে করে নিলেন! এ অধম্ম সইবে না আপনার। বজ্যাঘাত হবে মাথায়।'

উকিল কাকুও চেঁচিয়েজিলেন। বলেছিলেন, 'চুপ কর্ তুই। সাত দিনের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে না দিলে আদালতের পেয়াদা এনে আমি তোদের ঘর থেকে টেনে বের করে দেব।'

মৃগাঙ্ক মামাবাড়িতে ছুটে গিয়েছিল। সব শুনে ওঁরা হতভম্ব! বড় মামা কপাল চাপড়ে বললেন, 'সই করার আগে তুই যদি একবার আমাদের জানাতিস!'

মেজমামা বললেন, 'ও ছেলেমানুষ অত বোঝে নি। সাধুর ছদ্মবেশে দৈত্য এসেছে তা ও বুঝবে কেমন করে?'

তবু মামারা চেষ্টা করলেন, একজন উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। কিন্তু উকিল কাকু আটঘাঁট বেঁধেই কাজে নেমেছিলেন। তা ছাড়া কাকের মাংস কাকে খায় না। মামাবাবুদের উকিলের সঙ্গে তার কি পরামর্শ হলো কে জানে। তিনি এসে বললেন মৃগাঙ্ক খুব কাঁচা কাজ করেছে, মামলা করে লাভ নেই, অর্থদণ্ডই হবে শুধু।

তারপরই মৃগাঙ্ক বাড়ি ছেড়ে মামা বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল. হরিধনকেও নিয়ে এসেছিল। উকিলকাকুর মুখ দর্শন করতেও ঘৃণা হয়েছিল ওর। মামা-মামীরা অবশ্য ওকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই অন্যায়ের কথা সারাজীবন ও ভুলতে পারে নি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল যেমন করেই হোক এ অন্যায়ের প্রতিবিধান করতেই হবে। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে, বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে ও সুনাম পেয়েছে, জীবনে প্রতিষ্ঠা এসেছে, কিন্তু ওর প্রতিজ্ঞার কথা ও ভোলে নি। সেই সঙ্কল্প নিয়েই ও শুরু করেছিল বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা···

উকিল কাকুর কথায় ও আবার বাস্তবে ফিরে এল।

'কি হল, সই কর,' উকিলকাকু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, 'তোমার চোখ মুখ অমন দেখাচ্ছে কেন? শরীর খারাপ করে নি তো?'

'না, শরীর আমার ঠিক আছে,' মৃগাঙ্ক শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, 'আপনি কাগজপত্তরগুলো রেখে যান, আমি পড়ে দেখি, মামাবাবুদের দেখাই।"

'তার মানে তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না!' উকিলকাকু রুক্ষ গলায় বলে উঠলেন।

'একবার বিশ্বাস করে ঠকেছি,' মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেল মৃগাঙ্কর।

'কি বললে···একবার বিশ্বাস করে!' উকিলকাকু অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালেন।

'না, মানে,' মৃগাঙ্ক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, মামাবাবুরা এখন আমার মাথার ওপর, তাঁদের পরামর্শ ছাড়া আমি কিছু করতে পারব না।'

'আর আমি কেউ নই!' উকিলকাকু ভেংচে উঠলেন, 'আমি যে তোমার কিসে ভাল হবে ভেবে ভেবে রোগা হয়ে গেলাম, সেটা কিছু নয়।'

'আপনি দয়া করে আমার জন্যে কিছু ভাববেন না,' মৃগাঙ্ক শক্ত গলায় বলল, আমার জন্যে ভাববার লোক আছেন।'

'তুমি···তুমি···এত বড় কথা বলতে পারলে!' উকিলকাকু যেন তোৎলা হয়ে গেলেন, 'আমি তোমার বাবার বন্ধু ছিলাম···'

'না, আপনি টাকার বদলে বাবার কাজ করে দিতেন,' মৃগাঙ্কর গলা এবার তীক্ষ্ণ শোনাল, 'আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'বিশ্বাস করতে পারছ না!' উকিলকাকু যেন ওর কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না।

'না, পারছি না। আমার ভাল করার ইচ্ছেই যদি আপনার মনে থাকত তবে তাড়াহুড়ো করে আমাকে দিয়ে কাগজপত্তর সই করিয়ে নিতে চাইতেন না, তার আগে আমার মামাবাবুদের সঙ্গে কথা বলতেন।'

'ঠিক আছে, আমিও দেখে নেব,' উকিলকাকু দরজার দিকে হাঁটা দিলেন।

'শুনুন উকিলকাকু,' মৃগাঙ্ক পেছন থেকে বলে উঠল, 'আপনি এ বাড়ি দখলের আশা ছেড়ে দিন। আমি এ বাড়ি দান করে দেব, তবে আপনাকে নয়, রামকৃষ্ণ মিশনকে।'

উকিলকাকু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে চলে গেলেন। হরিধন বলে উঠল, 'মুখের মত জবাব দেছ খোকাদাদা ওনার ভাবগতিক আমারও ভাল ঠেকতেছিল না।'

একটা পরম তৃপ্তিতে ভরে গেল মৃগাঙ্কর বুক। এবার আর ও ভুল করে নি। অনেকদিনের পুষে রাখা ব্যথার আজ যেন উপশম হয়েছে, ওর কাজও ফুরিয়েছে।

ক্যালেণ্ডারের দিকে চোখ পড়তেই আমি চমকে উঠলাম। লাল কালিতে গোল দেওয়া তারিখটা আমায় মনে করিয়ে দিল প্রফেসর বোসের ফিরে আসার ওটাই হল নির্দিষ্ট দিন। উনি আমাকে ওঁর ফ্ল্যাটের চাবি দিয়েই গিয়েছিলেন।

সারাটা দিন আমার অস্থিরভাবে কাটল। রাত ঠিক পৌনে দশটার সময় আমি ওঁর ফ্ল্যাটে ঢুকলাম। দরজা জানালা এতদিন বন্ধ থাকায় একটা ভ্যাপসা গন্ধ। আমি সব খুলে দিলাম, বাইরের ফুরফুরে হাওয়া ঘরে ঢুকল। ল্যাবের মাঝখানে রোবটের মত অদ্ভুত যন্ত্রটা দাঁড়ানো ছিল। লাল রঙের গোলাকার একটা ধাতব বস্তু, মাথায় যেন একটা ক্যাপ। আমি ওটার সামনে দাঁড়ালাম, তারপর দুরু দুরু বুকে মাথার কাছে সবুজ বোতামটা টিপলাম। রাত তখন কাঁটায় কাঁটায় দশটা।

ভেতর থেকে একটা হিস হিস শব্দ বেরিয়ে এল, তারপর গুড়্ গুড়্ শব্দ, প্রতি মুহূর্তেই শব্দটা যেন বদলে যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপরই দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন প্রফেসর বোস, তাঁর চোখে মুখে সাফল্যের হাসি।

'হ্যালো প্রফেসর,' আমি জিগ্যেস করলাম, 'অপারেশন সাকসেসফুল?'

'হ্যাঁ, ডঃ মজুমদার, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

ডান হাতটা তিনি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

52A সতীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-26

পরজীবীর ইতিকথা

বলরাম মজুমদার

পৃথিবীতে জীবজন্তু নানাভাবে খাদ্য ও বাসস্থানের জন্যে লড়াই করছে। এই খাদ্য কেউ তৈরী করে নেয়, কেউবা, ঐ তৈরী খাদ্য কেড়ে খায়। একজন কষ্ট করে সঞ্চয় করে, অন্যজনে চুরি করে সেই সঞ্চয়। জীবজগতে এ ব্যাপারটা রয়েছে। একজনের পরিশ্রম করা খাদ্য অপর জনে চুরি করে খেয়ে নিচ্ছে ও চুপচাপ করে জীবন কাটাচ্ছে। এখানে তাদের কথাই তোমাদের কাছে বলতে চাইছি।

যে সকল জীবজন্তু খাদ্যের জন্যে অপরের ওপর নির্ভর করে তাদের পরজীবী বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় এণ্ট-এমিবা। এই এককোষী জীবটি মানুষের পেটের মধ্যে বাস করে। সেখানেই খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে, বংশ বিস্তার করে। কোনো অসুবিধা নেই। এসকারিস বা গোলকৃমি মানুষের পেটে বাস করে আর উকুন বাস করে মানুষের মাথায়। উকুন রক্ত শুষে খায়। কেউ বাস করে শরীরে ভিতরের দিকে আর কেউ বাস করে বাইরের দিকে। মোট কথা নানারকমের পরজীবী আছে। এখানে কয়েকটি পরজীবী গাছ ও জীবজন্তুর জীবনকথাই বলছি।

আমাদের সকলের ঘরবাড়ির চারপাশে যে পরজীবী গাছকে দেখা যায় তার নাম 'স্বর্ণলতা'। এই গাছটি সাধারণত অন্য গাছকে জড়িয়ে উঠতে থাকে। দেখতে সরু, পাতা খুব ছোট—নেই মনে হয়। রং হলদে। এটি পরজীবী গাছ। যে গাছকে সে আশ্রয় করে তার শরীরের মধ্যে ঢুকে থাকে তার শিকড় বা হস্‌টোরিয়া।

এই হস্‌টোরিয়া দিয়ে আশ্রয়দাতা গাছের তৈরী খাবার টেনে নেয়। এতেই চলে স্বর্ণলতা গাছের জীবন। সময়মত ফুল ও ফল হয়। গাছ পাতার সবুজকণিকার সাহায্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য তৈরী করে। স্বর্ণলতা গাছ তৈরী খাদ্য পায়, তাই তার না আছে পাতা, না আছে সবুজ ক্লোরোফিল কণিকা। পাতা নেই শিকড় নেই—হালকা, শরীর নিয়ে গাছের ওপরে লতার মত বাঁচতে সুবিধা। বীজ হয় খুব ছোট ছোট। হাওয়ায় উড়ে গিয়ে পড়ে অন্য গাছে। তার পর ছোট শিকড় বা হস্‌টোরিয়া প্রবেশ করায় আশ্রয়দাতা গাছে। এইভাবে চলে তার জীবনচক্র।

স্বর্ণলতা গাছের যখন দুটি বা তিনটি ডাল পাশাপাশি

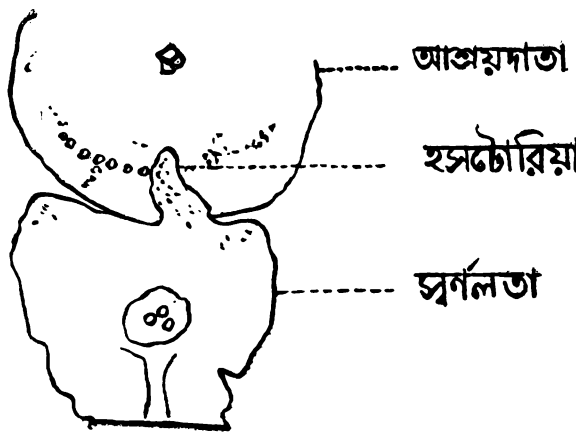

বাড়তে থাকে তখন দেখা গেছে তারা নিজেদের ডাল-গুলিকে জড়িয়ে বা পাকিয়ে এগোয়। পাকানোর গতিটা ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিক মেনে চলে। আশ্চর্যের বিষয় স্বর্ণলতার একটি ডাল তখন অপর এক ডালের মধ্যেও হস্‌টোরিয়া ঢুকিয়ে দেয়। তখন একডালকে বলে আশ্রয়দাতা আর অন্য ডালকে বলে পরজীবী।

এই হস্‌টোরিয়া কিভাবে তৈরী হয় তা সঠিকভাবে এখনো জানা যায় নি। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, যখন স্বর্ণলতার ডাল অন্য গাছের ডালে বা নরম জায়গার ওপর পড়ে, তখন স্বর্ণলতা একটা নরম প্যাড বা কুসন তৈরী করে। এইটাই আসলে হস্‌টোরিয়ার প্রস্তুতি। এই প্রিহস্‌-টোরিয়া থেকে একপ্রকার জারক রস নির্গত হয়, যেটা আশ্রয়দাতার দেহের উপরের কোষগুলিকে গলিয়ে দেয়। এই নতুন নরম জায়গা দিয়েই স্বর্ণলতা হস্‌টোরিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়ে দেয়।

এটা এক বিচিত্র ঘটনা। গাছের ওপরদিকের কোষ-গুলিকে বলে এপিডারমিস্‌ বা বহিঃত্বক। এদের কাজ ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখা। কিন্তু স্বর্ণলতার এক বিশেষ অভিযোজন হলো যে বাইরের কোষগুলি গ্লাও-এর মত কাজ করে। বাঁচার প্রয়োজন সহজ করার জন্যে বাইরের আবরণী কোষ রসক্ষরণের কাজ করছে। ফলে স্বর্ণলতার পরজীবী হয়ে বেঁচে থাকা সহজ হলো।

উদ্ভিদজগতে সবুজকণাহীন একপ্রকার ছত্রাক রয়েছে যারা পরজীবী। সরু সরু এদের দেহ। বড় বড় মহীরুহের দেহে এরা পরজীবী হয়ে বেঁচে থাকে। দেহের প্রয়োজনীয় রস কেড়ে খায়। গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়—এমন কি মৃত্যুও ঘটায়। বনজ সম্পদধ্বংসকারী পরজীবীদের হাত থেকে

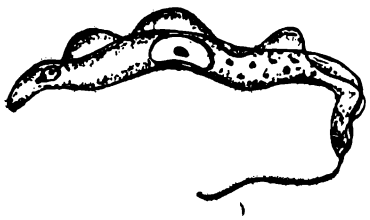

ট্রাইপোনেজোমা

গাছকে রক্ষা করা খুব সহজ কাজ নয়। বর্ষার সময় এই পরজীবীদের স্পোর বা বীজ বাতাস ভেসে এক গাছ থেকে অন্য গাছে যায়। সাধারণতঃ ভাঙ্গা বা কাটা জায়গা দিয়ে এই ছত্রাক প্রবেশের পথ করে নেয়। আশ্রয়দাতার দেহে এর বৃদ্ধি হয়—চলে জীবনধারণ ও বংশবিস্তার।

এবার দু একটা পরজীবী জীবজন্তুর কথা বলি, যারা বিশেষভাবে মানুষের ক্ষতি করে। মানুষের ক্ষতিকারক পরজীবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—এণ্ট-এমিবা [আমাশা], প্লাসমোডিয়াম [ম্যালেরিয়া], জিয়ারডিয়া [আমাশা], ট্রাইপেনোজোমা [ঘুমরোগ], ভূসোরবিয়া [গোদ], এসকারিস্ [গোলকৃমি] প্রভৃতি।

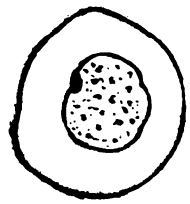

প্লাসমোডিয়াম

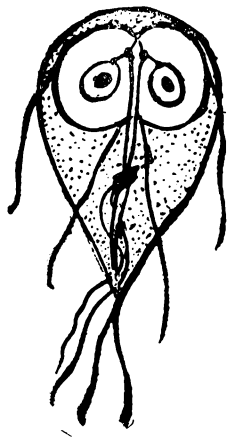

জিয়ারোডিয়া

এই সব ছোট ও বড় পরজীবীরা তাদের জীবনচক্রের কোন এক সময় মানুষের শরীরে অবস্থান করে। মানুষের খাদ্য কেড়ে খায়, বংশ বিস্তার করে। এদের জীবনযাত্রা বিভিন্নমুখী। দু-একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে। ম্যালেরিয়া ও ফাইলেরিয়ার পরজীবী একপ্রকার দেহ নিয়ে কিছুদিন মশার শরীরে থাকে ও পরে অন্য আর এক অবস্থায় মানুষের শরীরে থাকে; প্লাসমোডিয়াম পরজীবীরা মশার শরীর ত্যাগ করে মানুষের শরীরে ঢোকে ও নিজের শরীর অল্প বিস্তর পরিবর্তন হলে রক্তকণিকার মধ্যে ঢুকে বসবাস করতে শুরু করে। মশা মানুষকে কামড়ালে রক্তকণিকার সঙ্গে এই প্লাসমোডিয়াম আবার মশার মধ্যে যায়। শরীরের নানা পরিবর্তন ঘটিয়ে পুনরায় মশার মুখ থেকে অন্য মানুষের দেহে যায়। এই ব্যাপারটা ভূসোরবিয়ার বেলাতেও হয়। চলে এদের জীবন চক্র।

অন্য আর একটি পরজীবীর কথা বলতে চাই—তার নাম হুকওয়ার্ম। বিজ্ঞানীরা বলেন—এনকাইলোস্টোমা। মাঠে ঘাটে চলার সময় যারা খালি পায়ে হাঁটে এই পোকা তাদেরই আক্রমণ করার সুযোগ পায়। পায়ের চামড়া ফুটো করে এরা ভিতরে ঢোকে—পরে আস্তে আস্তে লিম্ফ নালী দিয়ে হৃদ্‌পিণ্ডে এসে পৌঁছায়। পরে ফুসফুসে যায় এবং নানা পথ ঘুরে পেটের মধ্যে পৌঁছায়। সেখানে পাকস্থলীর গা কামড়ে ধরে থাকে ও রক্ত শুষে খায়। রুগী রক্তশূন্যতায় ভোগে। তিলে তিলে হয় মৃত্যু।

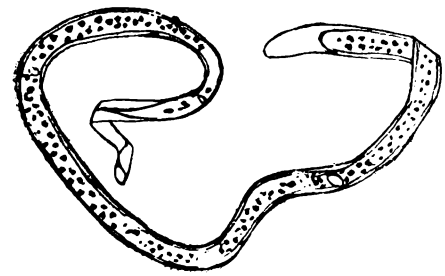

ওচেরেরিয়া

এই সব পরজীবীরা গাছ ও মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য গোপনে কেড়ে খায়। আশ্রয়দাতাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। পৃথিবীতে এরা বেশ ভালভাবেই বেঁচে থাকে। এক দেহ থেকে অন্য দেহে যেতে খুব অসুবিধা নেই। ভালভাবে বাঁচার জন্যে শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গের কিছু রদবদল করেছে। পৃথিবীতে আছে লক্ষ লক্ষ রকমের গাছপালা ও জীবজন্তু। এদেরকে আশ্রয় করে লক্ষ লক্ষ পরজীবী জীবন কাটাচ্ছে। কোনো অসুবিধা নেই। এদের একমাত্র চাহিদা—'চাই আশ্রয়,—চাই খাদ্য, চাই জীবনধারণ, চাই সন্তান-সন্ততির বিস্তার।' পরজীবীর জীবনে এই একটাই কথা। স্থানকাল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজেদের বদল করে,

এক্সডারিস্

পরিবেশের মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে সকলের চোখের আড়ালে দিন ভালই কাটাচ্ছে। এরা বড় স্বার্থপর। কে বাঁচবে বা কে মরবে—তার চিন্তা নেই। চিন্তা শুধু আমি ও আমার সন্তান।

বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলকাতা-9

গাছ যখন গোয়েন্দা

শৈবাল চক্রবর্তী

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড একবার এক অপরাধীকে ধরার কাজে একটি বাহারী চারাগাছের সাহায্য নিয়েছিল—খবরটা শুনতে অদ্ভুত হলেও সত্যি। লণ্ডনের এক অভিজাত পাঁচতারা হোটেল থেকে যখন কয়েক লক্ষ পাউণ্ড দামের হীরেটি চুরি যায় তখন গোয়েন্দাদের সঙ্গে সঙ্গে হোটেল কর্তৃপক্ষও আশা করেছিলেন যে, অতি আধুনিক অপরাধ নির্ণয়ের কৌশল প্রয়োগ করে অপরাধীকে ধরে ফেলা শক্ত হবে না।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে চোর, এমনই ধূর্ত যে অকুস্থলে সে এমন কোন সূত্রই রেখে যায় নি যা অনুসরণ করে গোয়েন্দারা তাঁদের তদন্ত চালাতে পারেন। হোটেলের প্রধান দরজা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এই সন্দেহ করে যে, চোর তখনও হোটেলের ভেতরই রয়েছে। গোয়েন্দারা প্রায় নিশ্চিত ছিলেন যে, এই অপকর্ম বাইরের কেউ নয় হোটেলের অগুণতি কর্মচারীদের মধ্যেই কেউ করেছে। কিন্তু কোন সূত্র বা প্রমাণের অভাবে তাকে খুঁজে বের করতে তাঁদের হিমসিম খেয়ে যেতে হচ্ছিল। বাঘা বাঘা গোয়েন্দারা যখন মাথা চুলকে সারা হচ্ছেন সেই সময় তাঁদের একজনের চোখে পড়ল—

যে ঘর থেকে চুরি গেছে মহামূল্য হীরেটি সেই সুসজ্জিত বেডরুমটির অনেক সাজসজ্জার উপকরণের মধ্যে রয়েছে টবে বসানো একটি বাহারী চারাগাছ। যে টেবিলের দেরাজে হীরেটি রাখা ছিল সেই টেবিলের একধারে বসানো রয়েছে এই চারাগাছটি। গোয়েন্দাটির মনে হল যে, এই একমাত্র প্রাণী এই ঘরে যে নীরব সাক্ষী এই অপকর্মের। মাথায় বিদ্যুৎচমকের মতো এই কথা খেলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি টেলিফোন করে আনালেন এক উদ্ভিদবিজ্ঞানীকে। বিজ্ঞানী এলেন আর তাঁর সঙ্গে এল কিছু যন্ত্রপাতি। গোয়েন্দাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ শলা-পরামর্শ করার পর উদ্ভিদবিজ্ঞানী সেই বাহারী গাছের পাতায় লাগিয়ে দিলেন শক্তিশালী ইলেকট্রোড। তারপর এক এক করে হোটেলের সব কর্মচারীদের হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল সেই গাছের সামনে দিয়ে। গোয়েন্দারা এবং হোটেল মালিক অবাক হয়ে দেখলেন যে, বিশেষ একজন ওয়েটার হেঁটে যাওয়ার সময় সেই গাছের শরীরে দেখা গেল এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া। এ প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট ধরা পড়ল পলিগ্রাফের মিটারে। গাছ এমন এক ভাষায় কথা বললো যা অনুচ্চারিত কিন্তু অমোঘ। এরপর লোকটিকে আলাদা করে নিয়ে জেরা করা হল যার ঠেলায় অল্পক্ষণ পরেই সে কবুল করল তার অপরাধ। হারানো হীরে ফিরে এল তার মালিকের কাছে। অপরাধ-বিজ্ঞানের সামনে খুলে গেল নতুন দিগন্ত।

গাছের প্রাণ আছে এ তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে বহু কাল পূর্বেই। সাম্প্রতিক গবেষণা চলছে গাছের অনুভূতি কত সূক্ষ্ম তা নিয়ে। গবেষণা চলছে বাইরের কোন শব্দ বা সুর তাদের প্রাণের জগতে কেমন সাড়া জাগায় তা নিয়ে। অর্থাৎ প্রমাণিত হয়েছে যে গাছের শুধু প্রাণই নেই, আছে অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিবোধ। কিছুদিন আগে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এক পরীক্ষা হয়েছিল। এতে কয়েকটি গাছের সামনে বেহালায় গৎ বাজানোর পর দেখা গেল, যে কটি গাছের সামনে বেহালা বাজানো হয়েছিল তারা অন্য গাছগুলির চেয়ে তাড়াতাড়ি বেড়েছে এবং পরিপুষ্ট লাভ করেছে অনেক বেশি। এতে বোঝা যায় যে যন্ত্রসঙ্গীত শোনার ক্ষমতা গাছেদের আছে এবং তার মূর্ছনা তার মনোজগতে এমন এক উত্তেজনার সঞ্চার করে যাতে তার বৃদ্ধি দ্রুততর হয়।

টবের গাছ ছাড়া ধান ও অন্যান্য শস্যক্ষেত্রেও পরীক্ষা চালানো হয়েছে। লাউডস্পীকারের দ্বারা সরবে গ্রামোফোনের গান বাজানোর পর দেখা গেছে যে, ধান, গমের ক্ষেত্রে ফলন বেড়েছে পঁচিশ থেকে চল্লিশ ভাগ। বাদাম ও তামাক গাছের ক্ষেত্রে শতকরা পঞ্চাশ।

এর পেছনে কি কারণ থাকতে পারে? বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, শব্দতরঙ্গের অভিঘাতে উদ্ভিদের মলিকিউলার ক্রিয়াশীলতার বৃদ্ধি ঘটে। তবে এরকম একটা ব্যাখ্যা দিলেও এ সম্পর্কে সব কথা বলা হয় না। গোটা বিষয়টা এখনও রহস্যে ঢাকা এবং সত্য উদঘাটনের জন্যে দেশে এবং বিদেশে বিজ্ঞানীরা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

গাছ কখনও কখনও মানুষের কাছে হয়ে দাঁড়ায় ভয় ও সর্বনাশের প্রতীক। প্রাণীভোজী বা কারনিভোরাস প্ল্যান্টকে এই গোত্রে ফেলা যায়।

বিজ্ঞানীদের হিসেব মত মোটামুটি পাঁচশো রকমের প্রাণীভোজী গাছ আছে। এর মধ্যে কোন কোন ভোজন-বিলাসী গাছ শুধু কীটপতঙ্গ আহার করেই খুশি নয়. পশুর মাংস খেয়ে হজম করার ক্ষমতাও এদের আছে। শিকার ধরার জন্যে শুঁড় থেকে সুরু করে সূক্ষ্ম জাল পর্যন্ত সব রকম অস্ত্রই এরা প্রয়োগ করে। বিজ্ঞানীরা আশংকা করেন সেপ্টো-পাসের কাহিনী গল্প হলেও কোন একদিন এইসব গাছেরা সংখ্যায় অগণ্য হয়ে দাঁড়াবে আর সুরু হবে তাদের অস্তিত্বের প্রধান শত্রু মানুষের সঙ্গে উদ্ভিদের এক প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পালা।

এমন কি কোনদিন সত্যি হতে পারে? কে জানে।

---

16 কালিবাড়ি লেন, কলিকাতা-31

আগামী কালের বিজ্ঞান

অজেয় রায়

কল্পনা করা যাক আগামীকালে বিজ্ঞানের কিছু সম্ভাবনা। কল্পনাই মানুষকে নতুন আবিষ্কারের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। অবাস্তব কল্পনা নয়, থাকা উচিত বাস্তব ভিত্তি। লক্ষ্য হোক মানব ও প্রাণিজগতের মঙ্গলসাধন। কল্পনাই আগামীকালের আবিষ্কারে উৎসাহ উদ্দীপনা জোগায়।

দেহে হঠাৎ কোথাও ক্রমাগত কোষবৃদ্ধির ফলে হয় ক্যানসার রোগ। চলছে গবেষণা। জানা যাবে এই রোগের আসল কারণ। তার নিরাময়ের উপায়। কেন তৈরি হয় অসুস্থ টিউমার! কিভাবে বন্ধ করা যায় এই মারাত্মক কোষবৃদ্ধি? বসন্ত বা জলাতঙ্ক রোগকে যেমন আজ বশ করা গেছে তেমনি ক্যানসার রোগকেও হয়তো বশীভূত করা যাবে।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে কাটাই? চব্বিশ ঘণ্টার প্রায় আট ঘণ্টা। অর্থাৎ জীবনের প্রায় 1/3 ভাগ। কতখানি সময় নষ্ট। পরিশ্রমের ফলে আমাদের স্নায়ুকোষ ক্লান্ত হয়। ঘুম দূর করে এই ক্লান্তি। নইলে জীবের ক্ষমতা ও আয়ু কমে যায়। উত্তেজক ওষুধ খেলে অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে জেগে থাকা যায়। কিন্তু পরে ঘুম তার পাওনা পুষিয়ে নেয়। শরীরের ক্ষতি হয়।

এমন একরকম বেতারতরঙ্গ আবিষ্কার হতে পারে যা ইলেকট্রোডের মাধ্যমে বা অন্য উপায়ে প্রাণীর মস্তিষ্কে চালনা করা হলে উজ্জীবিত হবে স্নায়ুকোষ। ফলে কেটে যাবে শ্রান্তি মাত্র দু-এক ঘণ্টার মধ্যে।

বংশগতির নিয়মকানুন কিছু কিছু আবিষ্কার হয়েছে। আরও হবার অপেক্ষায়। স্ত্রী-পুরুষের প্রজননকোষ মিলিত হয়ে সন্তান-কোষ সৃষ্টি করে। পিতা-মাতার আনুবীক্ষণিক কোষের মধ্যে লুকিয়ে থাকে তাদের দেহ ও মনের ছাপ—যা সন্তানের মধ্যে চালিত হয়। প্রতি কোষের মধ্যে আছে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে কিছু ক্রোমোজোম। প্রতি ক্রোমোজোমে আছে কিছু জীন বা ডি. এন. এ.। প্রতি প্রাণীর ক্রোমোজোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট। যেমন মানুষের 23 জোড়া, ভুট্টার 10। নিউক্লিয়াসের মধ্যে কিভাবে সাজানো থাকে ক্রোমোজোম-গুলি? ক্রোমোজোমের মধ্যে জীনের বিভিন্ন রকম প্যাটার্ন কি কি বিশেষ ইঙ্গিত বহন করে? জীব-রসায়নবিদরা তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। কিছুকালের মধ্যেই হয়তো জানা যাবে 'বায়োলজিকাল কোড।

তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সাহায্যে জীবকোষের নিউ-ক্লিয়াসের গঠন বদলানো যায়। উদ্ভিদের ওপর এই পরীক্ষা হচ্ছে। পাকা ফলের ওপর তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রয়োগ করে দেখা গেছে তার দেহকোষের নিউক্লিয়াসের গঠন বদলায়। কোনোটা ভাল, কোনোটা বা মন্দ ফল দেয়।

ভবিষ্যতে চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটতে পারে। যেমন, রক্তপাতহীন শল্যচিকিৎসা (সার্জারি)। শুনতে গাঁজাখুরি মনে হয়। তবু সম্ভব। দরকার উপযুক্ত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, যা অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ নিক্ষেপ করবে।

লিভারের মধ্যে পাথর। অপারেশন দরকার। প্রথমে পাথরটির অবস্থান বের করা হলো। তারপর ঠিক সেই জায়গায় বিশেষ ধরনের অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ তরঙ্গ দ্বারা আঘাত করা হল। নরম দেহকোষের ক্ষতি হবে না। বড় জোর সামান্য উত্তপ্ত হবে। কিন্তু শক্ত পাথরের খণ্ড হবে চূর্ণ! এইভাবে কাটাকুটি না করেও শরীরের ভিতর পাথর বা অন্য অনেক ক্ষতিকারক কঠিন বস্তুকে ধ্বংস করা সম্ভব।

হৃৎপিণ্ডের অপারেশনের প্রয়োজন। অল্প সময়ের মধ্যে সারতে হবে। হৃৎপিণ্ড চলছে। থামলেই মৃত্যু। হৃৎপিণ্ডের ক্ষত সেলাই করছেন সার্জন। ক্লান্ত চিকিৎসক। হাত আর কত দ্রুত চলবে। সামান্য ভুলে রুগীর জীব-দীপ যাবে নিভে। তার চেয়ে থামিয়ে দাও রুগীর আসল হৃৎপিণ্ডকে। বের করে আন। তার বদলে নকল হৃৎপিণ্ড শরীরের পরিশ্রুত রক্তের স্রোত চালনা করবে অ্যাওটা বা মহধমনীর ভিতর। রুগী অচেতন, কিন্তু জীবিত। সার্জন ধীরেসুস্থে মেরামত করবেন রুগীর জখম হওয়া আসল হৃৎপিণ্ডটি। তারপর ফের লাগিয়ে দেবেন বক্ষে। এবার চালু হবে আসল হৃৎপিণ্ড। এই ব্যাপার এখনি সম্ভব হচ্ছে কোথাও কোথাও।

এমন একদিন আসবে যখন দেহের কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট হলে বা আঘাতে ছিন্ন হলে তার জায়গায় লাগানো চলবে প্ল্যাস্টিক বা ওই জাতীয় জিনিসের তৈরি নকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। নকল হাত পা দিব্যি কাজ করবে। এখনও

একজনের শরীরের অঙ্গ অন্য কারো শরীরে বসালে ঠিক কাজ করে না। আমাদের শরীর অন্যজনের শরীরের বেশির ভাগ অংশ গ্রহণ করতে চায় না। ট্রান্সপ্লানটেশন এখনও পুরোপুরি সফল নয়। কিন্তু এমন দিন আসছে, যখন একজনের অঙ্গ অন্যজনের ব্যবহারে লাগবে। হিমঘরে জমিয়ে রাখা হবে মানুষ বা অন্য প্রাণীর মৃতদেহ। প্রয়োজনে তাদের হাত পা, মূত্রাশয় (কিডনি), হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে অন্যের শরীরে। যেমন এখন মৃতজনের কর্নিয়া লাগিয়ে জীবিত অন্ধলোক দৃষ্টি ফিরে পায়।

আগামীকালে কৃত্রিম খাদ্যের (Synthetic food) প্রচলন বাড়বে। তবে খেতের ফসল এবং মাংসের যোগানও বাড়বে বৈজ্ঞানিক উপায়ে। ফোটোসিনথেসিস্ বা সালোকসংশ্লেষের রহস্য কি জানা যাবে না? হয়তো যাবে। যার দ্বারা উদ্ভিদের সবুজকণা সূর্যের আলোর সাহায্যে কার্বন-ডাই অক্সাইড এবং জল থেকে তৈরি করে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন—যা জীব জগতের খাদ্য। এই রহস্য উদ্ধার হলে কৃত্রিম পদ্ধতিতে তৈরি করা যাবে কার্বোহাইড্রেট এবং প্রোটিন। আমাদের খাদ্যসমস্যা মিটবে।

ভূস্তরে খনিজ পদার্থের পরিমাণ নিঃশেষ হয়ে আসছে। কিন্তু সমুদ্রগর্ভে এখনও কত খনিজ পদার্থ মজুত। তাছাড়া সমুদ্রজলে দ্রবণ অবস্থায় রয়েছে নিকেল, কোবাল্ট, ভ্যানাডিয়াম ইত্যাদি। রয়েছে প্রচুর সোনা। সমুদ্রজল থেকে কম খরচে সহজে এই সব ধাতু নিষ্কাশন করা একদিন হয়তো সম্ভব হবে।

কমপিউটার যন্ত্রের চরম উন্নতি ঘটবে। তৈরি হবে অনুবাদক যন্ত্র। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায়।

কারখানায় যন্ত্রপ্রহরী কাজ করবে। এই প্রহরীরা মানুষ-শ্রমিক এবং উৎপাদনে নিয়োজিত যন্ত্রগুলির কাজ কর্মের তদারকি করবে। খেয়াল রাখবে সব ঠিকঠাক চলছে কিনা। এ কাজ তারা মানুষের চেয়ে ভালই করবে। যন্ত্র-প্রহরী মানুষের গলায় হুকুম করবে কর্মীদের। অবশ্য তা মানুষেরই গলা। যন্ত্রের ভিতরে লুকনো টেপরেকর্ডারে ধরা শব্দ বাজবে তাতে। যন্ত্র জানে কখন কি দিতে হয়। রোবট বা যন্ত্রমানব মানুষের বহু কাজ করে দেবে। এ সব সম্ভব ইলেকট্রনিকস-এ উন্নতির ফলে। বেতার ও বিদ্যুতের ব্যবহারে উন্নতির কারণে। তবে মানুষের চিন্তা ভাবনার শক্তি রোবটের থাকবে? বোধ হয় না।

মানুষের স্মৃতিকোষে অসংখ্য তথ্যকে জমিয়ে রাখার দরকার নেই। ইলেকট্রনিক তথ্যসংগ্রাহক মেশিন ধরে রাখবে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য। দরকার মতো বোতাম টিপে জেনে নাও।

আসছে বেতার যুগ। এসে গেছে। তবু অনেক সম্ভাবনাই এখনও বাকি। অতি উচ্চ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট বেতারতরঙ্গের প্রয়োগ কি কি হতে পারে? বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে চলেছেন।

অতি হ্রস্ব বেতারতরঙ্গ আবিষ্কার হচ্ছে। এইরকম বেতারতরঙ্গের সাহায্যে ক্ষুদ্র ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে যে কেউ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। প্রত্যেক বাড়িতে থাকবে গ্রাহক ও প্রেরক টেলিভিশন-সেট। ছোট লাইটারের আকার। কথা হবে মাউথপিসে আবার কথকদের চেহারা ভেসে উঠবে। এক ছোট্ট টেলিভিশন পর্দায়। এই যুগের টেলিভিশন ওয়ারলেস তখন অচল। মুখ না দেখতে পেলে কি কথা বলে সুখ। জামার পকেটে রাখতে পারা যাবে এমনি টেলিভিশনযুক্ত ওয়ারলেস যন্ত্র।

রসায়নে অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের বেতারতরঙ্গ বিপ্লব আনতে পারে। এর দ্বারা বদলানো যেতে পারে রাসায়নিক বস্তুর গঠন। অনুঘটকের দরকার হবে না।

বেতারতরঙ্গের সাহায্য ওড়ানো যাবে উড়োজাহাজ। এক ফোঁটা তেল দরকার নেই। মাথার ওপর উড়োজাহাজ। মাটি থেকে তাক করে পাঠানো হল অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের বেতারতরঙ্গ, যেমন সার্চ-লাইট পাঠানো হয় আকাশে। এইভাবে ভূপৃষ্ঠে বসানো বেতারকেন্দ্র মাথার ওপরে চালাবে উড়োজাহাজ। পেট্রোলিয়ামের সমস্যা মিটবে।

এমনি উচ্চ কম্পাঙ্কের বেতার-তরঙ্গ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় নাকি? এর আঘাতে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বাড়িঘর। প্রাণীর স্নায়ুকোষ। বাঁচার উপায়ও আছে। প্রতিসরিত করে তরঙ্গ। কিভাবে? তারও সূত্র পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

মহাকাশযানের যাত্রার সময় সামনে উল্কাখণ্ড পড়লে এমনি বেতারতরঙ্গ দ্বারা তা গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেওয়া যাবে। সরষের মতো ছোট্ট এক উল্কার সঙ্গে সংঘর্ষে ঘটলেও মহাকাশযান ফুটো হয়ে যেতে পারে। মহাকাশযানের সামনে সার্চলাইটের মতো ঘুরে ঘুরে পাহারা দেবে বেতার-তরঙ্গ ধারা (beam)। কোনো উল্কা সামনে পড়লেই এই বেতারশক্তির আঘাত তাকে মুহূর্তে উত্তপ্ত করে গ্যাসে পরিণত করবে।

বিজ্ঞানীরা ভাবছেন অতি উচ্চ কম্পাঙ্কের বৈদ্যুতিক প্রবাহ দ্বারা তৈরি করা সম্ভব পাহাড় ভেদ করে সুড়ঙ্গ। এমনি বৈদ্যুতিক প্রবাহের আঘাতে পাথর অল্পক্ষণেই

দারুন তেতে উঠে যাবে ফেটে। ক্রমে চূর্ণ হবে। তারপর গলে বেরিয়ে যাবে।

ভবিষ্যতে নকল সূর্য তৈরি হতে পারে। আকাশে বারোচোদ্দ মাইল উঁচুতে থেকে আলো দেবে সেই সূর্য। শীতের দেশ, সেখানে রোদের তেজ খুব কম, সেখানে এমন নকল সূর্য ভারি কাজে দেবে। আসলে এটা কোনো বাতি নয়। উচ্চ কম্প্যাঙ্কের কিছু বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছুঁড়ে দেওয়া হবে আকাশে। তারা কাটাকাটি করবে ওপরে। ফলে বাতাসের শ্বেতপ্রভা বিশিষ্ট নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন অণুগুলি জ্বলতে থাকবে।

ভবিষ্যতে তৈরি হবে খুব শক্তিশালী বেতার-দূরবীক্ষণ (রেডিও টেলিস্কোপ)। ধরা পড়বে মহাজাগতিক নক্ষত্র ইত্যাদির তেজস্ক্রিয় রশ্মিপ্রবাহ। তাই থেকে বোঝা যাবে বহু দূরের নক্ষত্রগুলির সম্বন্ধে নানা তথ্য। যা এখনকার দৃষ্টিনির্ভর দূরবীক্ষণ (অপটিকাল টেলিস্কোপ) দ্বারা কখনও সম্ভব নয়। এখনকার র‍্যাডার যন্ত্র এই ভাবে বেতার-তরঙ্গ ধরতে পারে। তারপর বেতার-তরঙ্গকে রূপান্তরিত করে আকাশে অবস্থিত বস্তুর চেহারা ফুটিয়ে তোলে পর্দায়। সেই একই মূলনীতি। তবে ঢের বেশি জোরালো। আরও অনেক খটমট। রেডিও-অ্যাস-ট্রোনমির সাহায্যে আমরা হয়তো জানতে পারব সৌর-জগতের রহস্য। এর অতীত এবং ভবিষ্যৎ। কি করে জন্ম হয় নক্ষত্রের।

প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে হবে বিরাট উন্নতি। হয়তো বেরিং প্রণালীতে বাঁধ দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে উত্তর মেরু থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে আগত হিমশীতল সমুদ্র স্রোত। ফলে এই শীতল স্রোতের প্রভাবে যে সব দেশে বড় বেশি ঠাণ্ডা পড়ে তা উষ্ণ আরাম-দায়ক হয়ে উঠবে। আবার মেরুপ্রদেশের শীতল সমুদ্র অঞ্চলে পাম্প করে পাঠানো যেতে পারে উষ্ণ স্রোতের জল। ফলে সেখান-কার ঠাণ্ডা কিছুটা কমবে। আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটবে। এমনিভাবে শীতল ল্যাব্রাডর স্রোতকে আটকে বা ঘুরিয়ে দিয়ে উত্তর আমেরিকার বহু উপকূলের আবহাওয়াকে উষ্ণ করে তোলা যাবে। জাপানের পাশ দিয়ে যাওয়া উষ্ণ কুরোসিও স্রোতকে শীতল ওখোটস্ক সাগরে ঘুরিয়ে এনে ফেলতে পারি।

সাহারা মরুভূমিতে একটা বিরাট হ্রদ কাটার পরিকল্পনা করছেন কেউ কেউ। ফলে এই বিশাল বন্ধ্যা মরুঅঞ্চল সুজলা সুজলা হয়ে উঠতে পারে। আবার সাইবেরিয়া থেকে প্রবাহিত নদীগুলির গতিপথ বদলে দেওয়া যায় মধ্য এশিয়ার মরুপ্রান্তের দিকে। ফলে সেখানে চাষবাস লোকবসতি অনেক সহজে হবে।

মহাকাশযাত্রা আজ আর পৃথিবীর মানুষের কাছে শুধু কল্পবিজ্ঞানের গল্প নয়। মানুষ সত্যি আজ মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে। পঞ্চাশ বা একশো বছর বাদে মহাকাশ যাত্রায় কি উন্নতি ঘটতে পারে তা বুঝি আজ কল্পনারও বাইরে। হু হু করে এগোচ্ছে এই বিজ্ঞান।

তবে আগামীকাল বা আগামী শতাব্দীর স্বপ্ন দেখতে হলে একটা কথা মনে রাখতে হবে। সেইদিন আসবে তো? না তার আগেই মানুষসুদ্ধু পৃথিবীর জীবজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে হাইড্রোজেন বোমা জাতীয় পারমাণবিক অস্ত্রের প্রলয় তাণ্ডবে। বিজ্ঞান এগোচ্ছে। কিন্তু মানব-হৃদয়ের উন্নতি হচ্ছে কি? এর উত্তর পাওয়া যাবে আগামীকালে।

শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

রবীন্দ্র সদনের বিপরীতে

জাতীয় শিশু গ্রন্থ মেলায়

ছোটদের বইয়ের স্বপ্নরাজ্য

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

বিঃ দ্রঃ কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুরোন সংখ্যাও কিনতে পাওয়া যাবে।

গ্রহণ-এর রহস্য

বিপ্লবশান্তি ভট্টাচার্য

ঠাকুমা দিদিমারা তো গ্রহণের কথা শুনলেই পুরাণের গল্প বলতে আরম্ভ করেন। গলা কাটা রাহু নাকি সূর্যকে গিলে ফেলে। আবার কাটা গলা দিয়ে সূর্য বেরিয়ে আসে ইত্যাদি। শীত হোক আর গ্রীষ্ম হোক স্নান না করলে শুদ্ধ হওয়া যায় না।

আজকের দিনে আর ততটা সবাই অজ্ঞ নই। আমরা মোটামুটি কিছুটা রহস্য জেনে ফেলেছি। ওই সব রাহু-টাহু আমরা বিশ্বাস করি না।

আসলে ব্যাপারটা হলো কি। সূর্যের চারদিকে পৃথিবী আর পৃথিবীর চারদিকে চাঁদ অবিরাম গতিতে নিজ নিজ কক্ষতলে ঘুরে চলেছে। নিজ নিজ কক্ষতলে ঘুরবার সময়, চাঁদ মাঝে মাঝেই পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে তার বিশাল কলেবরটি নিয়ে এসে দাঁড়ায়। এর ফলে চাঁদের অপর পাশে অর্থাৎ পৃথিবীর পাশে সৃষ্টি হয় একটা ছায়া। অনেক সময় দেখা যায় যে, পৃথিবীর কোন এক অঞ্চলের উপর চাঁদের ঐ বিরাট কলেবরের ছায়া এসে পড়ে। সেই সময় সেই অঞ্চলের লোকদের দৃষ্টির বাইরে চলে যায় সূর্য। ফলে পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণ দেখা যায়। ছায়া শঙ্কুর বাইরে কিছুটা জুড়ে সৃষ্টি হয় একটি আলো আঁধারি অঞ্চল। তাকে বলে 'প্রচ্ছায়া'। এই প্রচ্ছায়া পৃথিবীর যে যে অংশে পড়ে সেখানে সূর্যকে দেখা যায় আংশিকভাবে। ফলে সেখানে আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যায়। আবার এই ছায়া প্রচ্ছায়া অঞ্চলের বাইরে থাকে একটি আলোর শঙ্কু। তখন এই শঙ্কু পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলের উপর এসে পড়লে, সেই অঞ্চলের সূর্যকে একটি কালো থালার মতো দেখে। আর এর চার পাশে আলোর বলয় দেখতে পায়। তখন হয় সূর্যের বলয় গ্রহণ। অনেকে এটাকে বলয়গ্রাসও বলেন।

চাঁদের ছায়া 36,700 কিমি থেকে 38,000 কিমি অথবা সামান্য বেশিকমও হতে পারে। চাঁদ থেকে পৃথিবীর দূরত্ব 35.700 কিমি থেকে 40,700 কিমি মত। কাজেই ছায়া শঙ্কু সব সময়ই পৃথিবীর উপর নাও আসতে পারে। যদিও এই সমান্তরালে এদের অবস্থান। এই সময় পূর্ণ গ্রহণ না হয়ে বলয় গ্রহণ হয়। গ্রহণের দিনে পৃথিবীর দিকের চাঁদের পিঠটা থাকে অন্ধকার অর্থাৎ সূর্য গ্রহণের ক্ষণটি অমাবসব্যার দিন হয়। প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে প্রত্যেক অমবস্যার দিন সূর্যগ্রহণ হয় না কেন? তার কারণ চাঁদ ও পৃথিবীর কক্ষতলের ছেদ বিন্দুকে "নোড্" বলে। সূর্য ও চাঁদ তাদের কক্ষতলের যে কোন একটি নোডের কাছাকাছি থাকলে তবেই সূর্য-গ্রহণ হয়। পূর্ণ গ্রহণ হতে হলে কোণটি 9.9° ডিগ্রি থেকে 11·8° ডিগ্রি পর্যন্ত হতে হবে। সাধারণতঃ 160 কিমিঃ চওড়া একটি ছায়া ঘণ্টায় 3370 কিমিঃ থেকে 1695 কিমিঃ পর্যন্ত বেগে চলে। সেই ছায়া পৃথিবীর যে দেশের উপর দিয়ে যায় সেখানে তখন সূর্যগ্রহণ হয়। গ্রহণের স্থায়িত্ব বৈজ্ঞানিক মতে সাড়ে 7 মিনিট ও গড় 6 মিঃ। বিজ্ঞানী ইয়ং-এর মতে, একই জায়গায় পর পর দু বার পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণ হলে 360 বছরের ব্যবধান থাকা অবশ্যই দরকার। গ্রহণের এক ঘণ্টা আগে চাঁদের ছায়া পৃথিবীর ওপর নেমে আসে। গ্রহণের 15/16 মিঃ আগে যে পরিবর্তনশীল ছায়াগুলি পৃথিবীর উপর নেমে আসে সেগুলি তরঙ্গপূর্ণ এবং তাদের রংগুলি অদ্ভুত।

সূর্যের যে অংশ আমরা দেখতে পাই তাকে বলা হয় 'ফোটোস্ফিয়ার'। এর চারদিকে থাকে 'ক্রোমোস্ফিয়ার'। এর বিস্তার কয়েক হাজার মাইল মত। তাপমাত্রা প্রায় 8000—80,000k মতো (কেলভিন)। গ্রহণের আগে এই ক্রোমোস্ফিয়ার ভীষণভাবে জ্বলেওঠা আগুনের লেলিহান শিখার মত দেখায়। একে বলা হয় Solar Prominence। সূর্য সম্পূর্ণ অদৃশ্য হবার 2-3 মিনিট আগে কয়েকটি তরঙ্গায়িত ছায়া দেখা যায়, এগুলিকে একসঙ্গে 'স্যাডো ব্যাণ্ড' বলে।

বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে কতকগুলি কথা জানতে পারা যায়। যেমন সূর্য অদৃশ্য হবার পর তার চারপাশে একটি ফিকে আভা দেখা যায়, একে "করোনা" বলে! সূর্যের উপরিভাগের তাপমাত্রা 6000·k (কেলভিন)। কিন্তু এই করোনার তাপমাত্রা 20,00,000'k মত। কোন কোন জায়গায় তাপমাত্রা এর বহুগুণ বেশি। ঐ সব জায়গা গুলির নাম Hot Spot। কেন এমন হয়, প্রশ্ন উঠতে পারে। বিজ্ঞানীরাও এই কেনর এখনো স্পষ্ট বলতে পারেন না। করোনা থেকে যে সমস্ত রশ্মি বের হয়, তাদের দৈর্ঘ্যের প্রতিটি আলোর বিন্দুর আলো থেকে বর্ণালীবীক্ষণ পরীক্ষার সাহায্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যসূচক লাইন পাওয়া যায়। দেখা যায় যে, বুধ ও সূর্যের মাঝখানে আর একটি

ছোট বিন্দু নাকি আছে। এটিকে একটি গ্রহ বলে সূচিত করা হয়। ফরাসী বিজ্ঞানী লোকার্বো একটি প্রথম লক্ষ্য করেন একটি পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময়। এর নাম দেওয়া হয় "ভালকান"। এতদিন আমরা ন'—এ নবগ্রহ বলতাম। এবার দশগ্রহই নাকি বলতে হবে শুনছি। এছাড়া করোনাতে নাকি প্রায় 60টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। তারা প্রত্যেকেই নাকি আয়নিত অবস্থার আছে।

পৃথিবীর মত সূর্যেরও যে বায়ুমণ্ডল আছে তা প্রথম প্রমাণ হয় 1881 খৃষ্টাব্দে 28 জুলাই। 1905 সালে আইনষ্টাইন তাঁর বিখ্যাত Theory of relativity'-তত্ত্বের দ্বারা প্রমাণ করেন যে, আলোকরশ্মি সূর্যের দিকে গেলে সূর্যের প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণশক্তির ফলে তা সূর্যের দিকে বেঁকে যাবে। যদিও আপাত দৃষ্টিতে আলো ও সূর্যের মধ্যে কোন মহাকর্ষীয় বল নেই কিন্তু আইনষ্টাইন ও পরে এডিংটন প্রমাণ করেন আলোকরশ্মি সূর্যের কাছাকাছি গেলে 1,74 (সেকেণ্ড) কোণে বেঁকে যাবে এবং সূর্যের দিকে তা অবতল হয়ে থাকবে এবং ওদের দূরত্বের সঙ্গে ব্যাস্তানুপাতিক হবে। এর প্রমাণের জন্য পূর্ণ গ্রাস গ্রহণে সূর্যের নিকটবর্তী তারকার ছবি তোলা হয়। আবার গ্রহণের শেষে তারকার ছবি তোলা হয়। দুইটি ছবির তুলনায় এর প্রমাণ মেলে। 1919 সালের পূর্ণ-গ্রাস গ্রহণে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় এডিংটন ও ক্রেমলিনের প্রমাণ পাওয়া যায়। 1922 সালের 21শে সেপ্টেম্বর-এর পূর্ণগ্রাস গ্রহণে কানাডায় এব লীফ্ মানমন্দিরে এর প্রমাণ মেলে। ভ্যানরিবুকে 1947 সালের 20 মে যে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ হয়, তাতে বিক্ষেপের পরিমাণ ছিল 2·01 সেকেণ্ড। কিন্তু সব তর্কের শেষ হলো 1952 সালের 25শে ফেব্রুয়ারী তখন এর পরিমাণ 1'70 সেকেণ্ড। হিসাব করে দেখা যায় যে, ঠিক ঠিক অবস্থায় প্রতি বছর 7 বার মত গ্রহণ হতে পারে। তার মধ্যে পাঁচটি সূর্য এবং দুই চন্দ্র গ্রহণ। অথবা চারটি সূর্য গ্রহণ আর তিনটি চন্দ্র গ্রহণ। 1901 থেকে 2000 সাল পর্যন্ত মোট 375টি গ্রহণ হবার কথা। 228টি সূর্যগ্রহণ আর 147টি চন্দ্র গ্রহণ।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণে একটি অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। সব দিক অন্ধকারে ঢেকে যাওয়ায় গরু, ছাগল এবং অন্যান্য সব পশুপাখীদের রাত্রিকার মত কাজকর্ম আরম্ভ হয়। চারদিক একদম যেন নিশ্চুপ হয়ে যায়। সকলেই ভাবে রাত নেমে আসছে। গাছপালাদের মধ্যেও রাত্রিকার মত আচরণ দেখা যায়। যে জবা ফুল দিনের আলোয় লাল হয়ে ফুটে থাকে। ঐ সময় তা বন্ধ হয়ে চুপসে যায়। কেন যে এসব হয় তা সঠিক ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেন নি।

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

কাচের উপর নক্সা

অজিত চৌধুরী

কাচ খুব শক্ত জিনিস। কাচ কাটতে হীরকের প্রয়োজন হয়। কাজেই সাধারণভাবে এর উপর নক্সা করা সহজ নয়। এখানে কঠিন (Solid) কাচের উপর নক্সা কথা বলছি। গলিত তরল কাচ ছাঁচে ফেলে নক্সা করা যেতে পারে। কিন্তু কিছু পারাফিন আর হাইড্রো-ফ্লোরিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ হলে কঠিন কাচের উপর নক্সা করা যেতে পারে। প্রথমে যে কাচের উপর নক্সা করতে হবে তার উপর প্যারাফিনের একটি আস্তরণ লাগাতে হবে। ধরা যাক্, একটি পদ্ম ফুল আঁকতে হবে। এবার একটি সরু নিব দিয়ে প্যারাফিনের আস্তরণ কেটে একটি পদ্ম ফুল এঁকে নিতে হবে। অঙ্কিত জায়গাগুলিতে খাদের সৃষ্টি হবে। এবার ঐ খাদগুলিতে ব্রাশ দিয়ে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ লাগাতে হবে। নক্সা খোদাই হবে। আসলে কাচের মধ্যে থাকে সিলিকা (SiO_2)। এটি হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সিলিকন টেট্রাফ্লোরাইড তৈরী করে: $SiO_2 + 4HF = SiF_4 + 2H_2O$ সিলিকন টেট্রাফ্লোরাইড গ্যাস বলে উবে যায় এবং কাচের গায়ে খোদাই হয়।

নক্সা খোদাই হবার পর কাচটিকে জল দিয়ে ধুয়ে ফেললে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড চলে যাবে। এরপর প্যারাফিনকে একটি ছুরি দিয়ে চাঁচলে বা তার্পিন তেলে ডুবিয়ে রাখলে প্যারাফিন চলে যাবে।

কয়লার উৎপত্তি

মুক্তিপদ দাস

আমাদের এক অতি পরিচিত ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কয়লা। শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে আজকের এই যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে কয়লার এক অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। রেলগাড়ি, জাহাজ, বিদ্যুৎ, ইস্পাত-কারখানা, পাটকল, কাপড়কল ইত্যাদি বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই কয়লা এক অপরিহার্য কাঁচামাল। আবার বাড়িতে রান্নার জন্যে উনুনে চাই কয়লা। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে কয়লা ছাড়া আজকালকার জীবনযাত্রা একেবারে অচল।

এই পদার্থটি কি উপাদান দিয়ে গঠিত ; কোথায়, কি-ভাবে, কত পরিমাণে রয়েছে ; তার উৎপত্তি কিভাবে হ'লো এবং কিভাবে তাকে আমরা ভূপৃষ্ঠের নিচে থেকে তুলছি, সে সম্পর্কে জানতে স্বভাবতই আমাদের মনে কৌতূহল হয়। এখানে সে বিষয়ে আলোচনা করছি।

কয়লা হচ্ছে আসলে প্রস্তরীভূত উদ্ভিদ-দেহাবশেষ। অর্থাৎ ছোট বড় নানারকম গাছপালা ও লতাপাতা সুদীর্ঘ সময় ধরে বিপুল পরিমাণে জমা হয়ে অবশেষে এক দহনশীল পাথরে পরিণত হয়েছে—যা আমরা কয়লা হিসেবে এখন পাচ্ছি। উদ্ভিজ্জ বস্তুর পাথরে পরিণতি-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লাজাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। যেমন পীট (Peat)—যা নরম, জলীয় পদার্থ-যুক্ত এবং খুব নিকৃষ্ট মানের জ্বালানী এবং লিগনাইট (Lignite) —যা আর একটু বেশি প্রস্তরীভূত এবং আর একটু উঁচু-মানের জ্বালানী। এই দুই পদার্থকে ধরা হয় কয়লা-পূর্ব-অবস্থায়। আমরা সাধারণত যে কয়লা জ্বালানী হিসাবে ভারতে ব্যবহার করি তাকে বলে বিটুমিনাস (Bituminus) কয়লা। ইউরোপে আরও উৎকৃষ্ট মানের একপ্রকার কয়লা পাওয়া যায়—যা আরও শক্ত, উজ্জ্বল এবং আরও কম জলীয় ও উদ্বায়ী পদার্থযুক্ত। এই কয়লাকে বলে অ্যান্-থ্রাসাইট (Anthracite)।

কয়লা পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডের কতকগুলি ইতস্তত ছড়িয়ে-থাকা কয়লা-ক্ষেত্রে (Coalfield) পাওয়া যায়। এক একটি কয়লাক্ষেত্র হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের পাললিক (sedimentary) শিলা-সমন্বয়ের এলাকা। এই সমস্ত এলাকায় বেলে পাথর (Sandstone) ও শেল-পাথর (Shale), অর্থাৎ পলি জমে যে স্তরীভূত পাথরে পরিণত হয়, এই দুই প্রকার পাথরের স্তরের সঙ্গে কয়লার স্তর (Coal seam) নানারকম বিন্যাসে সজ্জিত আছে এবং এই স্তর-গুলিকে সাধারণত একাধিক সংখ্যায় নিচে থেকে ওপরে অব-স্থিত দেখা যায়।

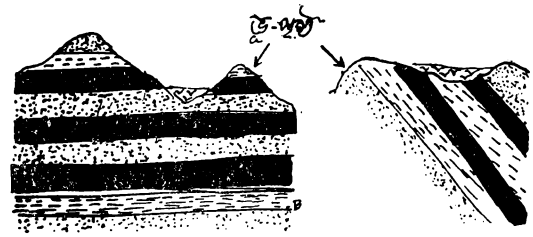

অনুভূমিক কয়লাস্তর হেলানো কয়লাস্তর

কয়লা-স্তর গুলিকে কখনও মোটামুটি আনুভূমিক বা অল্প হেলানো (যেমন ভারতবর্ষের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে) এবং কখনও বা হেলানো বেশি (dlpping) কিম্বা ভঙ্গিল (folded) অবস্থায় (যেমন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইউরোপে) পাওয়া যায়। বিস্তৃতি বরাবর কয়লাস্তর অনেক সময় কোনও দিকেমোটা এবং কোনও দিকে সরু হয় এবং সরু হতে হতে ক্রমে বিলুপ্ত ঘটে। বেশির ভাগ কয়লা-স্তরের মধ্যে কিছু কিছু অদাহ্য পাথুরে জিনিসের ক্ষুদে স্তর থাকে, যার ফলে কয়লার মান কমে যায়। ভূগর্ভস্থ ফাটল বরাবর 'চ্যুতি'র (fault) ফলে অনেক সময় কয়লাস্তরের বিস্তৃতি ক্ষুণ্ন হয়। কোথাও কোথাও আগ্নেয়শিলার অনুপ্রবেশের ফলে ভূগর্ভে কিংবা ভূপৃষ্ঠের কাছে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম আগুনের প্রভাবে কয়লাস্তর আংশিক বা পুরোপুরি পুড়ে যায়। এই সমস্ত পুড়ে-যাওয়া কয়লাকে 'ঝামা' বলে। এইভাবে কয়লাক্ষেত্রের কোনও একটি জায়গায় ভূপৃষ্ঠ থেকে শুরু করে কয়েকশো এমনকি দু-এক হাজার মিটার গভীর পর্যন্ত একাধিক এমনকি দশ বিশটা স্তর কয়লা পাওয়া যায়। এক একটি কয়লার স্তর আবার একশো মিটারেরও বেশি মোটা হতে পারে। ভারতের দু-এক জায়গায় এমনটি পাওয়াও গেছে।

এই সব কয়লাস্তরের উৎপত্তি হলো কীভাবে? ব্যাপারটা ভারতের পটভূমিতেই ভাবা যাক্। ভারতের কয়লাক্ষেত্রগুলির আকৃতি, পারস্পরিক অবস্থান, তাদের শিলাস্তরগুলির বিন্যাস ও গঠন, শিলার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা সাধারণভাবে এর এক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আজ থেকে প্রায় পঁচিশ কোটি বছর আগে ভারতের ভূপৃষ্ঠের গঠনে কয়েকটি দীর্ঘাকৃতি নিম্নাঞ্চল ছিল—যা ছিল প্রধানত নদীর অববাহিকা অঞ্চল এবং যেখানে ভূপৃষ্ঠ ক্রমাগতভাবে আশেপাশে অঞ্চলের তুলনায়

ধীরে ধীরে নিচে বসে যাচ্ছিল। এর ফলে নদী-গহ্বরে বালি, নুড়ি ইত্যাদি নদীর খর স্রোতে বয়ে এসে জমা হচ্ছিল এবং কালে সেই বালি-নুড়ি জমে বেলে পাথরে পরিণত হয়েছে। একই সময়ে নদীর দুই তীরে পলি জমা হত, যে পলি জমে শেল-পাথরে পরিণত হয়েছে। নদীর তীর ছাড়িয়ে বিস্তৃত সমতল নিম্নাঞ্চলেও পলি পড়ত বন্যার জল থেকে এবং সেখানে ঘন বনাঞ্চল বর্ধিত হত। সেই বনাঞ্চলের উদ্ভিদ-দেহাবশেষ ক্রমাগতভাবে কয়েক কোটি বছর ধরে মোটা মোটা স্তর আকারে জমা হচ্ছিল, ও ক্রমশ গভীরে এসে জমে দহনশীল পাথর-কয়লাতে পরিণত হয়েছে। নদীর বাঁকা গতির দরুন নদীতট এক-ধারে ক্ষয়ে অপর ধারে বালি নুড়ি জমা হতে থাকে এবং এইভাবে নদীর গতিপথ সরে যাবার ফলে বালি-নুড়ির স্তর, পলি ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের স্তর একে অপরের উপর জমা হয়। এইভাবেই এখানকার বেলে পাথর, শেল-পাথর ও কয়লার স্তরবিন্যাসের উৎপত্তি।

নদী অববাহিকা ছাড়াও অগভীর হ্রদ এবং নদীমোহনার ব-দ্বীপ অঞ্চলেও প্রচুর পরিমাণ উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্ভব এবং সেখানেও ভূপৃষ্ঠ বসে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কয়লাস্তর জমতে থাকে বালি ও পলির স্তরের সঙ্গে। সুন্দরবনের বদ্বীপ অঞ্চলে 'পীট' জমা হচ্ছে, যা বহু যুগ পরে কয়লাতে পরিণত হবে। আসামের কয়লায় উৎপত্তি নদী-মোহনা অঞ্চল থেকে বলে মনে করা হয়।

কয়লার স্তর যেখানে অল্প গভীরে অবস্থিত, অথবা হেলানো স্তরের অগভীর অংশের কয়লা তোলা হয় তার ওপরের পাথর ও মাটি যান্ত্রিক বা কায়িক উপায়ে সরিয়ে বেশি গভীরে অবস্থিত কয়লা-স্তর এবং হেলানো স্তরের গভীর অংশ থেকে কয়লা তোলার জন্যে ভূগর্ভ খনি নির্মাণ করতে হয়।

কেন্দ্রীয় খনি পরিকল্পনা ও নকশা সংস্থা,
1 নং আঞ্চলিক কার্যালয়, আসানসোল

আগামী সংখ্যা
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু সংখ্যা

জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প, সরস সচিত্র প্রবন্ধ, আবিষ্কারের গল্প, যন্ত্রনির্মাণ কৌশল, চিঠিপত্র ও মূল্যবান আলোকচিত্র সমৃদ্ধ।

বেরোবে ১লা ডিসেম্বর
বর্ধিত কলেবর এই সংখ্যাটির
দাম হবে ৩·০০ টাকা

প্রচার দপ্তর:
কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান
৮/১ এ শ্যামাচরণ দে, স্ট্রীট কলি-৭৩

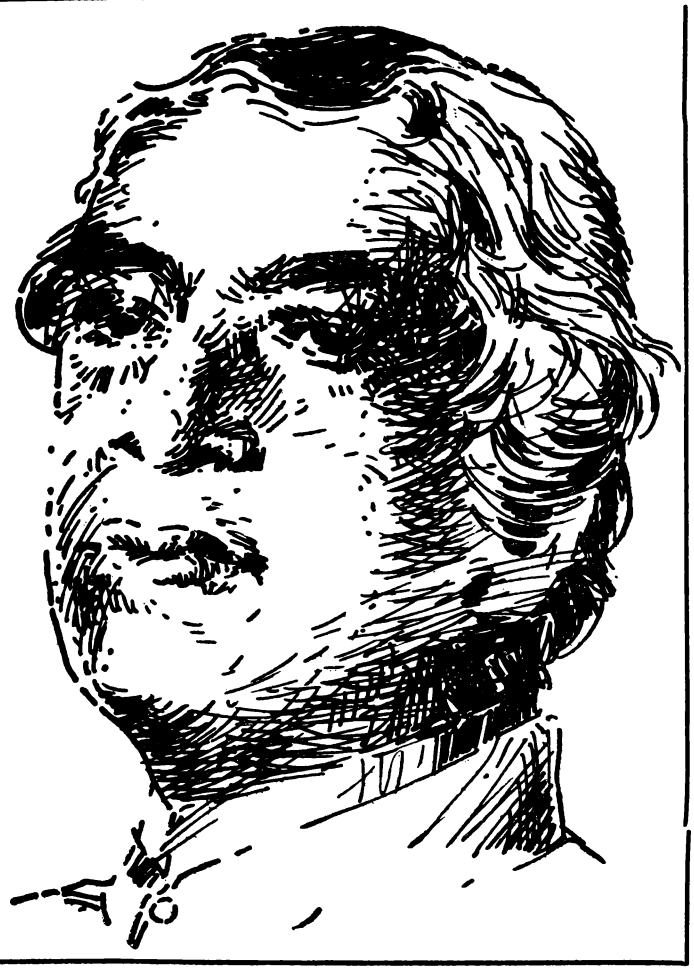

মডেল প্রশ্ন-উত্তর সমাধানের যন্ত্র

জ্যোতিষ সরকার

যে যন্ত্র মডেলটির কথা বলতে যাচ্ছি, সেটা তৈরী করা খুবই সহজ। এর কাজ হচ্ছে কতগুলি প্রশ্নের সঠিক সমাধান (উত্তর) করা। অবশ্য প্রশ্ন ও উত্তর গুলি আগে থেকে তৈরী করা থাকবে। কেমন করে জিনিষ-গুলো স্থাপন করবে পর্যায়ক্রমে সেগুলো বলছি। তার আগে বলে নিই কি কি জোগাড় করতে হবে তোমাকে ঃ

(1) 10″×12″ সাইজের পাতলা কাঠের বোর্ড, কাঠ নরম হবে এবং এর এক পিঠ অবশ্যই সমতল হবে। (2) তারসহ চারটে 1.5 volt-এর ব্যাটারী (3) একটি 6 ভোল্টের কলিং বেল (4) বোর্ড পিন 25/30টা ( ) 1″ তামার পেরেক 2টো (6) সংযোগ-কারী তার।

প্রথমে বোর্ডটির উপরের দিকে এক ধারে ব্যাটারীর তার এবং অপর ধারে কলিং বেল বসিয়ে নাও। বোর্ডের বাকী যে অংশকুটু ফাঁকা রইল তাতে পেনসিল দিয়ে দাগ দিয়ে দুটো ভাগ কর। বাঁ এবং ডান দিকে দু ধারেই কতগুলি বোর্ড পিন দু সারিতে পুঁতে দাও (ছবির মত)। পিনগুলি এমন হবে যেন ভেদ করে পিছন দিকে পিনের সূঁচালো অংশ সামান্য বেরিয়ে থাকে।

এবার কতগুলি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশ্ন তৈরী কর এবং তার উত্তর লেখ। প্রতিটি প্রশ্ন ও প্রতিটি উত্তর এক-একটি সাদা কাগজের টুকরোয় লিখবে। এখন বাঁ দিকে পিনগুলির পাশে প্রশ্নগুলি পর পর আঠা দিয়ে আটকিয়ে দাও। আর ডান দিকের পিনের পাশে আটকাবে উত্তর-গুলি কিন্তু এলোমেলো (প্রশ্নের তুলনায়) থাকবে। ঠিক প্রশ্ন পত্রে যেমন প্রশ্ন স্তম্ভের সঙ্গে উত্তর স্তম্ভের মিল করতে বলা হয়ে থাকে, তেমনি।

এবার বর্তনীর কাজ শেষ হলেই মডেলটি সম্পূর্ণ হবে। বোর্ডের উল্টোদিকে যে প্রশ্নের উত্তর ঠিক সেই প্রশ্ন ও উত্তরের পিন দুটির সূঁচালো প্রান্ত একটি তার দিয়ে যোগ করে দাও। তেমন অসুবিধা হলে কোনো রেডিওর দোকানে গিয়ে ঝালাই দিয়ে আটকিয়ে নিয়ে এসো।

এখন, কলিং বেল এবং ব্যাটারীর উভয়ের একটি প্রান্ত পরস্পর জুড়ে দাও। অপর প্রান্ত দুটি থেকে দুটি তার (হাতখানেক লম্বা) যুক্ত করে নাও। এই তার দুটির মুক্ত প্রান্তে যে তামার পেরেকের কথা বলেছি, তা আটকানো থাকবে।

ব্যাস, মডেলটি সম্পূর্ণ হ'ল। তোমার কোনো বন্ধুকে যন্ত্রটি দিয়ে বলো কোন্ প্রশ্নটির উত্তর কি হবে। এজন্য সে তারের সঙ্গে যুক্ত পেরেকের একটি যে কোনো একটি প্রশ্নের পিনের সঙ্গে যোগ করে অপরটি উত্তরের পিনের সঙ্গে স্পর্শ করবে। যদি তার নির্বাচন সঠিক হয় তবে বেল বেজে উঠবে, কিন্তু না হলে বাজবে না। প্রতিটি প্রশ্ন উত্তর নির্বাচনের সময় এমন হবে।

নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কেন এমন হয়? তামার পেরেক দুটি যদি তার দিয়ে যুক্ত করা হয় তবে বর্তনী (circuit) সম্পূর্ণ হয় এবং বেল বাজতে থাকে। যেহেতু প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে সঠিক উত্তরের যোগ রয়েছে, সুতরাং শুদ্ধ নির্বাচন মানেই বর্তনী সম্পূর্ণ করা, আর সে জন্যেই বেল বেজে ওঠে।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন উত্তরগুলি তুলে দিয়ে অন্য প্রশ্ন-উত্তরও বসাতে পারো। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে প্রশ্নের সঙ্গে শুদ্ধ উত্তরেরই যেন যোগাযোগ থাকে।

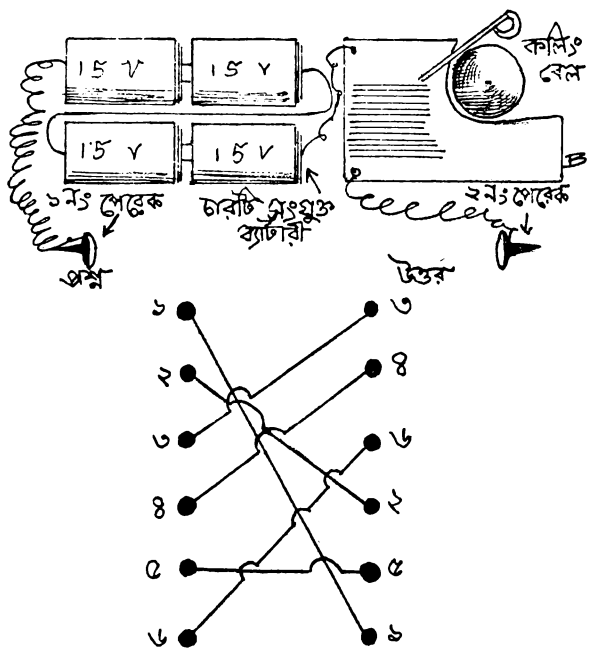

নেতাজী পল্লী, পোঃ খড়িবাড়ী
জেলা ঃ দার্জিলিং-734327

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় জয়ন্ত দত্ত

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা সেপ্টেম্বর 83 এর দশ বা তার বেশি সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

কলকাতা—জ্ঞানপ্রকাশ মজুমদার, মলয় দাশ, অজয়েশ ঘোষাল, প্রণবকুমার সরকার, ঝুমকি সরকার, শৌভিক নন্দী, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, শুভঙ্কর চক্রবর্তী।

2 -পরগনা—ভাস্কর নন্দী, উৎপলকুমার বিশ্বাস, পার্থ চক্রবর্তী, মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী, সনাতন ঘোষাল, অশোক কুমার মজুমদার, মোঃ রেজাউল, মন্দিরা মজুমদার, ঊর্মি চক্রবর্তী, ব্রততী কর্মকার, বাসবদত্তা রায়, অনন্যা সাহা, বর্ণালী কুশারী, শংকর বিশ্বাস, স্বাতী বিশ্বাস, কিংশুক মুখার্জী।

হাওড়া—নিমাই সাউ, গোপালচন্দ্র পাল, উজ্জ্বল চন্দ্র, অসীমকুমার চন্দ্র, তাপসকুমার রীত, মানসী রীত, শম্পা দত্ত, অসিতকুমার রীত, অমিতাভ বেরা, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়।

হুগলী—শুভেন্দু খাঁ, আলপনা খাঁ, অঞ্জনা খাঁ, পার্থ কুণ্ডু, কুণাল সেনগুপ্ত, পঙ্কজ চক্রবর্তী, সংযুক্তা দত্ত-গুপ্তা, প্রবীরকুমার ঘোষ, তাপস দে, সুব্রত মোদক, সুকুমার মোদক, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, মানা বুজ, মিনতি মোদক, সুপ্রিয় মোদক, আশিষকুমার সাহা, স্বরূপকুমার পাল, স্বাতী ঘোষ, অমিতাভ ঘোষ, অজয় চৌধুরী, সঞ্জয় চৌধুরী, রাজা কিলিকদার, শুভাশিস ঘোষ, অশোকবিজয় সরকার।

বর্ধমান—নিশার আখতার, চঞ্চল হাজরা, তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিকচন্দ্র কুণ্ডু, শুভাশিষ কুণ্ডু, কাকলি কুণ্ডু, পঙ্কজ বাগ, প্রদীপ মুখোপ্যাধ্যায়, রাজীব মুখার্জী, কৃষ্ণগোপাল সেন, কৌস্তুভ নাগ, ফাল্গুনী দাস, দুলাল দে, পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়, কিংশুক সেন, অনুপম বিষয়ী, বনানী বন্দ্যোপাধ্যায়।

মেদিনীপুর—অসীমকুমার সামন্ত, শান্তনু কারক, মাওবী রায়, স্বপনকুমার অধিকারী, স্নেহাশিষ দাস, শিপ্রা ঘাঁটি, তুহিনকুমার হাটুই, রজত মাইতি, সৌম্যশান্ত পাহাড়ী, শঙ্করকুমার অধিকারী, ত্রিশঙ্কু পাত্র, উত্থানপদ বর্মন, ইন্দ্রজিৎ সান্যাল, মধুমিতা সিনহা।

নদীয়া—সুজিতকুমার খাঁ, পার্থপ্রতিম তরফদার।

মুর্শিদাবাদ—চিন্ময় মুখোপাধ্যায়, শুভাশিষ মুখোপাধ্যায়, অভিজিৎ দে, আবুল কালাম, নুরুল ইসলাম, সরিয়ুত ইসলাম, আব্দুল মান্নান, মুশাশেখ সেখ, মহাবুল হাসান।

মালদা—অরুণকুমার বিশ্বাস।

বীরভুম—মতিউর রহমান, সুমিতা ঘোষ, রত্না দত্ত, দীপনারায়ণ দত্ত, দিলীপকুমার মণ্ডল, প্রিয়জ্যোতি, বিষ্ণু-জ্যোতি, সৌরজ্যোতি ও মানস ভট্টাচার্য, অমিতাভ চন্দ, বামদেব সরখেল।

বাঁকুড়া—শ্যামসুন্দর সাহা, সন্দীপকুমার সামন্ত, দীনবন্ধু মিশ্র।

পুরুলিয়া—বিপ্লব সেন, কৃষ্ণা সেন, সুমন ঘোষ, সুব্রত মুখার্জী, জয়দীপ প্রামাণিক, অমল দাস, তপন দত্ত, সন্দীপ প্রামাণিক, সমীর মাজী, প্রদীপ শীল, সব্যসাচী মাঝি, পিংকু সরকার, সন্দীপ পাল, জয়দীপ পাল, বিশ্বনাথ ধর, সঞ্জয় কর্মকার, জয়ন্তকুমার ঘটক, মিঠু ঘটক।

দার্জিলিঙ—পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী।

'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকার নাম ও আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই সংখ্যা থেকে 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা'র নাম পরিবর্তন করা হলো।

এখন থেকে প্রতি মাসে 'সায়েন্স কুইজ' এর পরিবর্তে "নলেজ ক্যুইজ" প্রকাশিত হবে।

পরিচালক ঃ ছোটদের দপ্তর।

নলেজ ক্যুইজ

অমরনাথ রায়

1. কার রাজত্বকালে 'ইবন বতুতা' ভারতে এসেছিলেন ?
2. 'ডেকামেরন' গ্রন্থটি কে রচনা করেছিলেন ?
3. কলকাতার 'প্রেসিডেন্সী কলেজ'-এর নাম পূর্বে কি ছিল ?
4. কোন্ নদীকে 'চীনের দুঃখ' আখ্যা দেওয়া হয় ?
5. বোকারো ইস্পাত কারখানা ভারতের কোন্ রাজ্যে অবস্থিত ?
6. বর্তমানে ভারতের সংবিধান অনুযায়ী কয়টি মৌলিক অধিকার আছে ?
7. World Cup ফুটবল খেলা শুরু হয় কোন্ সাল থেকে ?
8. মেক্সিকোর মুদ্রার নাম কি ?
9. কোন্ খেলায় সবচেয়ে বড় মাঠের প্রয়োজন হয় ?
10. অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় প্রতীক কি ?
11. এলাহাবাদের 'কুম্ভমেলা' প্রতি ক' বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয় ?
12. স্টোরেজ ব্যাটারীতে কোন্ ধাতু ব্যবহৃত হয় ?
13. 'জডরেল ব্যাঙ্ক' কি কোনও ব্যাঙ্ক না অন্য কিছুর নাম ?
14. মানুষ প্রথম কোন্ ধাতু ব্যবহার করে ?
15. এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতির নাম কি ?

(সমাধান প্রকাশিত হবে পরবর্তী সংখ্যায়)

সেপ্টেম্বর-83 বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার সমাধান

1. কপূরের আণবিক সংকেত। 2. 2240 পাউণ্ডে এক টন হয়। 3. 10. পাউণ্ড। 4. ট্রপোস্ফিয়ার। 5. 14·7 পাউণ্ড। 6. 100° সেলসিয়াস। 7. অপ্টি-মিটার। 8. হেরম্যান ড্রেসার (Herman Dreser) 9. উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। 10. 10 ঘণ্টা 14 মিনিটে। 11. জেমিনি—8 12 রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। 13. অশ্বশক্তি = 746 ওয়াট। 14. The Tulip. 15. লোমবিহীন মেক্সিকান কুকুর Chihuahua.

শব্দকুট/পল্লব মোহান্ত

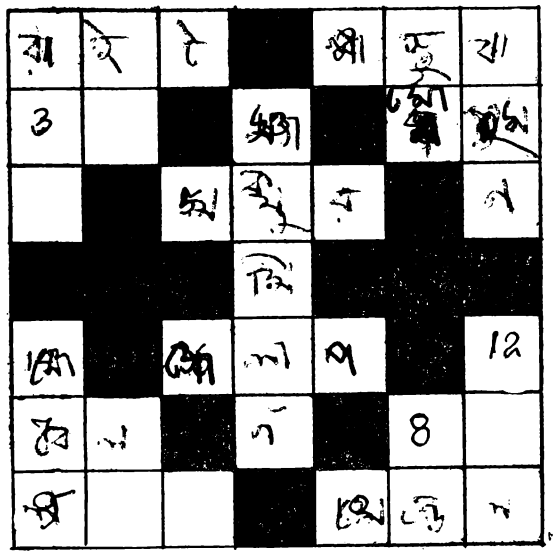

পাশাপাশি ঃ—

1. উড়োজাহাজের আবিস্কারক।
2. জলাতঙ্করোগের টিকার আবিস্কারক।
3. এক রকম রোগ 4. মৌমাছির দেহনিসৃত রস।
5. ভারতের জাতীয় পাখী। 6. একটি পরিচিত ফুল।
7. টেলিফোন যন্ত্রের আবিস্কারক।
8. একটি মরুভূমির উদ্ভিদ।
9. জিংক সালফেট যে জিনিস। 10. জীনের আবিস্কারক।

উপর-নিচে ঃ—

1. একপ্রকার রেচন পদার্থ।
11. 1930 সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজ পান।
12. নিউক্লিয়াস আবিষ্কারক।
13. বাইসাইকেলের আবিষ্কারক।
14. ডিনামাইটের আবিষ্কারক।

ভেবে ভেবে বল'র উত্তর

1. ক) জ্যাক ও লেনটার্ণ ; (Jack o Lantern)
(খ) গ্রীন গিল ফুয়াগাস (Green Gill Fuagas)
(গ) ডেথ্ ক্যাপ (Death Cap)
2. স্যালিভারি গ্লাণ্ড (Salivary Gland)
3. ক্যালসিয়াম সিলিকেট, ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট
4. পেনিনসিলভানিয়ান
5. মাইক্রোসকোপ
6. (i) সেলাই মেশিন আবিষ্কারক
(ii) টাইপরাইটার আবিষ্কারক 7. সূর্য।

ভেবে ভেবে বল • শুভব্রত রায়চৌধুরী

1, নিচের ছবিগুলো এক ধরনের উদ্ভিদের। এদের নাম বল।

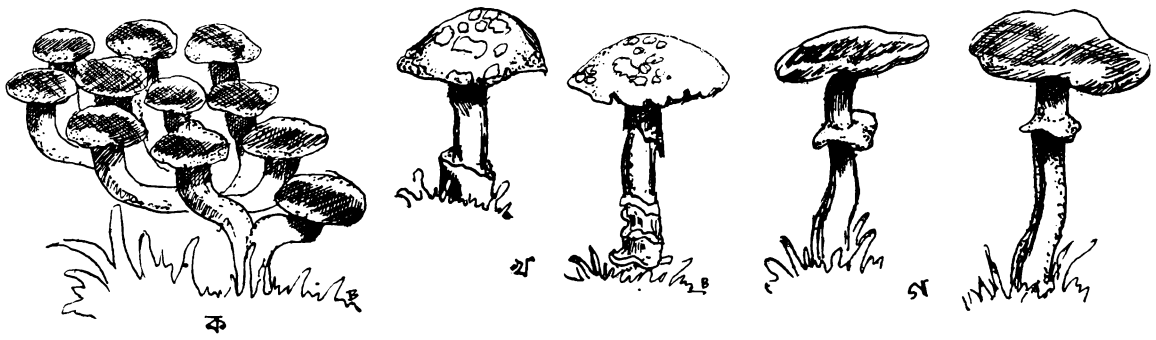

2. পাশের ছবিটিতে মানব-দেহের মুখের ভেতরে একটি গ্রাণ্ডের ছবি। এর নাম বল।

3. কোন্‌টা ঠিক ভেবে বলো।
এসবেসটসে থাকে ঃ
(ক) ক্যালসিয়াম সিলিকেট, কপার সিলিকেট,
(খ) ক্যালসিয়াম সিলিকেট ; ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট
(গ) জিঙ্ক ও লোহা

4. যে যুগে সব থেকে বেশি কয়লার সন্ধান পাওয়া যায় সেই যুগের নাম।
(i) রিনায়োসন্স পিরিয়ড, (ii) পেনিনসিল ভানিয়ান পিরিয়ড।

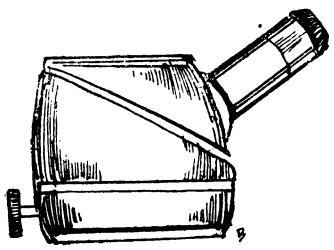

5. পাশের ছবিটি কোন্‌ যন্ত্রের উপরের অংশ ভেবে বলো।

6. নিচের দুজন লোক কি জন্য পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়েছিলেন ভেবে বল।
(i) 1830 সালে বারথেলমি থিমোনিয়ার
(ii) 1829 সালে উইলিয়াম বার্ট।

7. গ্রীক শব্দ হিলিয়স (HELIOS) মানে
(1) চাঁদ ; (2) সূর্য (3) তারা।
কোন্‌টি ঠিক ভেবে বল।

সেপ্টেম্বর সংখ্যার শব্দকূটের সমাধান

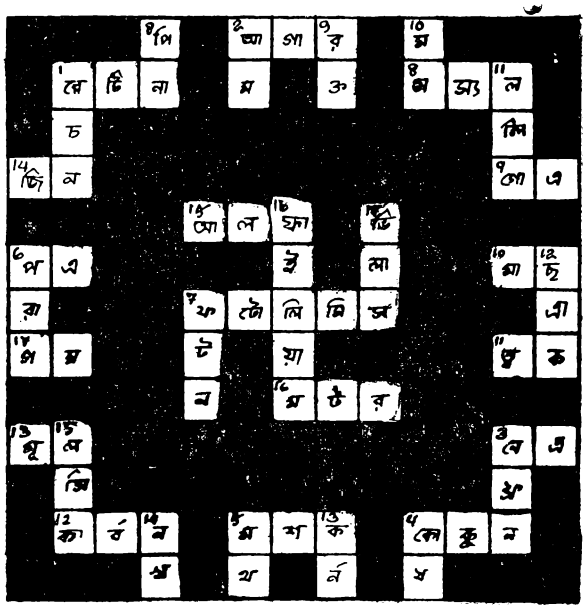

104, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলি-8

পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে আমন্ত্রিত রচনায় নির্বাচিত

আমার গ্রামের পরিবেশ সমস্যা

দীপনারায়ণ দত্ত

আমোদপুর বীরভূম জেলার একটি পঞ্চায়েত সমিতি পরিচালিত গ্রাম। এই গ্রামে আমি বাস করি। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি 'আরবান ভিলেজ'।

এখানে একটি সরকার পরিচালিত চিনিমিল, চারটি বৃহৎ ধানমিল, দুটি বৃহৎ সরিষার তৈলমিল আছে। তা ছাড়া আছে মাঝারী ধরনের হাস্কিং মিল ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের পাইকারী বিক্রয়কেন্দ্র।

এখানে কোন দৈনিক বাজার বসে না। সপ্তাহে দুদিন হাট বসে। গ্রামের অধিকাংশই সন্নিহিত অঞ্চলে আদিবাসী সাঁওতাল, বায়েন, চাষী কৈবর্তদের বাস, যাদের প্রধান জীবিকা কৃষিশ্রমিকরূপে, কিছু অংশের জনমজুরও মিলের অস্থায়ী শ্রমিক রূপে।

গ্রামের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে দুটি বৃহৎখাল (স্থানীয় ভাষায় কাঁদর) বয়ে চলেছে যার একটির সঙ্গে বক্রেশ্বর নদী ও অপরটির সঙ্গে ময়ূরাক্ষী নদীর যোগ আছে।

এলটি প্রধান সড়ক গ্রামটিকে প্রধান দুভাগে বিভক্ত করেছে। এই সড়ককে শের শাহের বাদশাহী সড়ক বলা হয়। সড়কের দুপাশে বড় বড় বট, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বিভিন্ন ফলের গাছ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির শান্ত স্নিগ্ধরূপ প্রকাশ করছে।

গ্রামের জনসংখ্যা ছয় হাজার। জমির সীমা 1 বর্গ-মাইল। গ্রামের চারপাশ ঘিরে বিস্তীর্ণ চাষের জমি।

এই গ্রামকে আমি মনপ্রাণ দিয়ে ভাল বাসি। এর যে কোন পরিবর্তনই আমার মনে প্রতিক্রিয়া ঘটায়। কিছু কাল থেকেই আমি লক্ষ্য করছি—কিভাবে এখানে চিমনী থেকে কালো ধোঁয়া গ্রামের গাছগুলোর পাতাকে বিবর্ণ, নির্জীব করে দিচ্ছে, কিভাবে চাষের জমি দখল করে, গাছপালা নির্বিচারে কেটে, কারখানাগুলোর সীমানা বাড়ানো হচ্ছে, কিভাবে কলকারখানার যান্ত্রিক কর্কশ আওয়াজ আমাদের দেহমনকে অবসন্ন ও মেজাজকে খিটখিটে করে দিচ্ছে।

চিনিমিলের চিনি তৈরীর মরশুমে তিন-চার মাস আমাদের নাকে কাপড় দিয়ে থাকতে হয়। সবসময় বাতাসে আখ পচানোর গন্ধ বাতাসকে যেন পচিয়ে দেয়।

অল্প পরিসরের মধ্যে এবং জনবসতির সীমানায় কলকারখানার অবস্থানের জন্যে শ্রমিকরা মাথাগোঁজার জন্যে নিজেরাই খুশীমত যেমন তেমন আশ্রয় বানিয়ে নিয়েছে। পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা নেই, স্যানিটারী পায়খানার তো দূরের কথা খাটা পায়খানাও নেই কেননা মিউনিসিপ্যালিটি নেই। জঞ্জাল যত্রতত্র ফেলা হয়। টিউবওয়েলের সংখ্যা হাতে গোনা যায়, খরার ফলে কুঁয়ো, পুকুর জলশূন্য। ফলে জলের জন্য জলযুদ্ধ সর্বক্ষণ। কুঁয়ো, পুকুর বহুকাল সংস্কারের অভাবে জল মনুষ্য ব্যবহারের অযোগ্য। ফলে আমাশয়, টাইফয়েড, কৃমি অতি সাধারণ রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাস্তার দুপাশে যে গাছের কথা আগে লিখেছি সেগুলি ও অন্যান্য গাছপালাও আমি লক্ষ্য করছি কিভাবে একশ্রেণীর মানুষ আশুলাভের আশায় প্রথমে পাতা, ডালপালা কেটে গাছকে নিস্তেজ করে দিয়ে পরে গাছ শুকিয়ে গেলে সবটাই কেটে নিয়ে জ্বালানী বা আসবাবপত্র তৈরী করে। বারণ করলে শোনে না। কেন না ওরা দলবদ্ধ ও সরকারী প্রশাসন এসব বিষয়ে উদাসীন। বৃক্ষরোপণ উৎসব করেই তারা দায়মুক্ত, রক্ষণের কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেই।

আজ কয়েকবছর লক্ষ্য করছি, বৃষ্টিপাত আগের মতো হচ্ছে না। মেঘ উড়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছে। মনে হয়, গাছগুলি ও আশেপাশের বনভূমি নির্বিচারে কাটার ফলেই এই পরিণাম। গ্রীষ্মকালে ছায়ার অভাবে গরু, ছাগল এমনকি মাঠে কাজ করা মানুষদেরও জীবন ওষ্ঠাগত।

আর একটা বিষয় লক্ষ্য করছি যে, শাকসব্জী, আনাজ ও ফলমূলের আকার বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু স্বাদহীন। এর কারণ মনে হয় চাষীদের মধ্যে অত্যধিক মাত্রায় কেমিক্যাল সার ও কীটঘ্ন ঔষধের প্রয়োগ। জান্তব সার আর আজ-কাল মাঠে প্রয়োগই হয় না। ফলে জমিরও স্বাভাবিক উর্বরতা শক্তি হারিয়েছে। আর আমার পরিচিত পাখী, কীটপতঙ্গগুলোও যেন আর দেখতে পাচ্ছি না। কত বিভিন্ন প্রকারের লতা, উদ্ভিদ দেখতে পেতাম সেগুলিও মনে হয় মাঠে কীটঘ্ন ঔষধ প্রয়োগের ফলে মারা যাচ্ছে।

আগে যে দুটি কাঁদরের কথা উল্লেখ করেছি সেগুলোতে কলকারখানাগুলো আবর্জনা ও অবশিষ্টাংশ ফেলার স্থান

করেছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চারপাশের মাঠের ধোয়ানো জল যাতে কীটঘ্ন ঔষধ যা কাঁদরের জলকে মাঝে মাঝেই বিষাক্ত করে তোলে। মাছও মরে ভেসে উঠছে বারবার।

এইসব চাষের আনাজ, শস্য ও শাকসব্জী ফল খেয়ে ও দূষিত জল ব্যবহার করে গ্রামের অধিকাংশ দরিদ্র, অশিক্ষিত জনগণ বারমাসই উদরের পীড়াতে ভুগছে। এসবের প্রতিকার তো একা কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে প্রতিকারের আশায় লোকেরা ভগবানের কাছেই প্রার্থনা করে মাত্র।

রাস্তা দিয়ে আগে 2/4 খানি মোটর গাড়ির চলাচল দেখা যেত। এখন সারাদিনরাত্রি বাস, লরী, ট্রাক, মিনি-বাস, মোটরসাইকেল, টেম্পো, ট্রাক্টর কত প্রকার যানবাহন চলছে। সেই সঙ্গে রাস্তার ধুলো ওড়া, হর্নের ও ইঞ্জিনের বিকট শব্দ, কালোধোঁয়া সব মিলিয়ে মনে হয় নরক গুলজার। নাকে রুমাল, কানে তুলো এমনকি চোখেও গগলস্ পরে রাস্তা চলতে হচ্ছে।

কাঁদরের খাত আবর্জনা, বালি ও পলি পড়ে পড়ে এত উঁচু হয়ে উঠেছে যে বর্ষার সময় ব্যারেজ থেকে অল্প জল ছাড়লেই গ্রাম বন্যার জলে ডুবে যাচ্ছে। নদীখাত গভীর করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তাই মনে হয় বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে মানুষের জীবন যাত্রার উন্নয়নের কাজে লাগানো যেমন অবশ্যই প্রয়োজন, তেমনি মানুষেরই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে এই আশীর্বাদ পরিকল্পিত ভাবে প্রয়োগ না হবার ফলে বা অজ্ঞাতবশতঃ বা ব্যক্তিগত আশু লাভের জন্যে অভিশাপে পরিণত না হয়। আর এ বিষয়ে সরকারী ও বেসরকারী উভয় স্তরেই সমস্যার অনুধাবন ও প্রতিকারের উদ্যোষ গ্রহণ করা উচিত। এবিষয়ে 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান'কে জানাই অজস্র অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা। কেননা জন্মলগ্ন থেকেই এই বিজ্ঞান পত্রিকা আমাদের পাঠকমনকে পরিবেশচেতনা, পরিবেশ দূষণ সমস্যা বিষয়ে সচেতন করছে।

আমোদপুর, বীরভূম।

জানা-অজানা ঃ

মৎস্যকুলের বিচিত্র তত্ত্ব

সুশান্ত ভট্টাচার্য

পৃথিবীর মৎস্য-শ্রেণীর অর্থাৎ মাছেদের জীবন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বেশ কয়েকটি বিচিত্র ও আগ্রহজনক আবিষ্কার জানা যায়।

'স্পিড্‌ল' নামে একপ্রকার মাছ গাছে বাসা বাঁধে। এরা জলাশয়ের ধারে ছোট ছোট গাছের ডালে শেওলা ও ঘাসকুটো দিয়ে ঐ বাসা প্রস্তুত করে ডিমে তা দেয়। এদের আকার অনেকটা কই মাছের মতো।

উড়ুক্কু মাছ (flying fish) নামক একপ্রকার বড় পাখনাযুক্ত মাছ সময়ে সময়ে জল ছেড়ে লাফিয়ে ওপরে ওঠে, এবং পাখনায় ভর করে বেশ কিছুক্ষণ শূন্যে বাতাসে ভেসে চলে। এইভাবে কখনও কখনও এরা বেশ কয়েকশ' ফুট গিয়ে আবার জলে পড়ে যায়। এইভাবে পাখা মেলে শূন্যে ভেসে চলাকে অনেকে ওড়া মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে এটি ভোলাণ্ট অভিযোজন বা Volant adaptation ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ পর্যন্ত প্রায় 150 রকম বিদ্যুৎ উৎপাদক মাছের হদিস পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে বজ্র মাছ, বৈদ্যুতিক বাইন, স্কেট্ প্রভৃতি অন্যতম। বৈদ্যুতিক বাইন-এর শরীর থেকে কখনও কখনও 300 ভোল্ট পরিমাণের বিদ্যুতের তেজ নিষ্কাসিত হয়।

'মাছেদের দৌড়-প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থানাধিকারী কে ?'—এ বিষয়ে দুটি মত আছে ঃ কেউ বলেন হাঙ্‌র, কেউ কেউ বলেন ম্যাকারেল নামে একপ্রকার মাছ যারা নাকি ঘণ্টায় 35 মাইল পর্যন্ত বেগে সাঁতার কেটে ছুটে যেতে পারে।

পোনামাছের দেহে পিটুইটারী হর্মোন প্রয়োগে বদ্ধ পুকুরেই ডিম পাড়ানো সম্ভবপর। সাধারণতঃ আষাঢ়—শ্রাবণ মাসের মধ্যেই এই হর্মোন 2/3 কে জি ওজনের স্ত্রী ও পুরুষ মাছের লেজের দিকের পেশীতে সিরিঞ্জ দ্বারা প্রবেশ করানো হয়। তারপর মশারি ধরণের ছোট কাপড়ের চৌবাচ্চা বা 'হাপা'-র মধ্যে সেগুলিকে রেখে জনন কার্য সম্পন্ন করাবার পর উৎপন্ন বাচ্চাগুলিকে তিনদিন পর ছোট 'আঁতুড় পুকুর' বা Nursery tank-এ রাখা হয়।

As/21 বিদ্যাসাগর পল্লী, দুর্গাপুর—13

কল্পবিজ্ঞানের গল্প

প্রফেসর ডিরোজিরো ও আমি

নির্মল কুমার

শীতের সকাল। চারিদিকে ঘন কুয়াশা পড়েছে, বেশ অন্ধকার আন্ধকার, একটু দূরের জিনিস দেখা যায় না। সাতদিন আগে ঠিক এইরকম সময়ে প্রফেসর ডিরোজিরোর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। মানুষটাকে আমার পছন্দ হয় না, বড়ো উল্টোসিধে কথা বলেন। আমাকে দেখলেই আরম্ভ করবেন নানা কল্পবিজ্ঞানের কাহিনী। আজও আবার দেখা করবেন বলে গেছেন। তাই তিনি আসার আগেই আমি কেটে পড়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওঠবার আগেই চোখে চোখ পড়ে গেছে। তাই কাছে আসামাত্রই জিজ্ঞাসা করলাম, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?

প্রফেসর ডিরোজিরো হাত নেড়ে বললেন, 'ও, নো' তোমাকে কিছু করতে হবে না, আমি তোমার কাছে কিছু বক্তব্য রাখতে এসেছি। বাধ্য হয়ে বললাম, বলুন। প্রফেসর বললেন, জানো, এখন এ পৃথিবীতে এমন পারমাণবিক অস্ত্র মজুত আছে, যা এই পৃথিবীকে চারশবার ধ্বংস করা যাবে।

—এসব আমার জানা আছে।

এখন, তোমাদের পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম কেনার অর্থাৎ যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছে।

—চলছে যখন, তখন চলতে দিন।

—তুমি একটা গবেট, কিছু বোঝবার চেষ্টাকর না, এস আমার সঙ্গে, দেখে যাও নিজের চোখে।

এই বলে প্রফেসর একটা যানে আমাকে নিয়ে গেলেন। বললেন, চল আমাদের পৃথিবী দেখবে চল।

—আমাদের বলতে?

—আমাদের বলতে আমাদের, যেটা এখান থেকে সাত হাজার কোটি মাইল দূরে অবস্থিত। তোমাকে দুমিনিটেই পৌঁছে দিতে পারি।

—যেতে পারি, কিন্তু একটা কিন্তু আছে।

—কী?

—আবার আমাকে এখানে পৌঁছে দেবেন তো?

—'ও' হো, এই কথা, ঠিক আছে কোনো ভয় নেই হে।

ঠিক দুমিনিট পরে আমরা নতুন পৃথিবীতে পৌঁছে গেলাম। জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা। আসার পর থেকেই শীত শীত ভাব। প্রফেসার ও আমি একটা বাড়িতে ঢুকলাম, চলে গেলাম সিধে ব্যলকনিতে।

—আরে, ওখানে তো শীতকাল ছিল। এখানে দেখছি গ্রীষ্মকাল।

—কেন? ভাল লাগছে না বুঝি, এই বলে প্রফেসর একটা সুইচ টিপলেন। বললেন, এই নাও তোমার শীতকাল। সঙ্গে সঙ্গে শীতকাল এসে গেল, সেই ঠাণ্ডা হাওয়া, কুয়াশার চতুর্দিক ব্যাপসা হয়ে এল। আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। প্রফেসর ডিরোজিরো আবার মুখ খুললেন, এর আয়তন জানো তোমাদের পৃথিবীর ডবল কিন্তু লোকসংখ্যা অতি সামান্য 1903 জন।

—মাত্র।

—হ্যাঁ, এই বলে প্রফেসর এক একটা সুইচ টিপতে থাকলেন। আর আমার চোখের সামনে এক একটা বিকলাঙ্গ মানুষের ছবি ভেসে উঠতে লাগল। প্রফেসর বলে উঠলেন, এই 1903 জনের মধ্যে সুস্থ মানুষ আছি মাত্র আমরা দশ জন বাকী সকলে বিকলাঙ্গ অথবা মস্তিষ্ক-জনিত রোগে ভুগছে। এসব কিছুর জন্য দায়ী যুদ্ধ এবং পরমাণু অস্ত্র, যেগুলো নিয়ে তোমরা এখন ছিনিমিনি খেলছো। দেখ চারিদিক চেয়ে আমাদের এখানকার বিজ্ঞান কত উন্নত। আজ আমাদের কাছে সব কিছু আছে, নেই শুধু মানুষ। আজ মানুষ না দেখে, তার সঙ্গে না কথা বলে হাঁপিয়ে উঠি, তাই তোমার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করেছিলাম। তোমাদের পৃথিবী যেন আমাদের পৃথিবীর মত না হয় সেই চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তোমরা তা বুঝতে চাও না। একদিন আসবে যখন এর মতন অবস্থা হবে ঐ পৃথিবীর। সব মরে যাবে যে কজন বাঁচবে তাঁরা হবে বিকলাঙ্গ, আর এরপর যারা জন্মাবে তারাও হবে বিকলাঙ্গ। তখন বিজ্ঞান দিয়ে কিছু করতে পারবে না—এই বলে প্রফেসর ডিরোজিরো উচ্চহাস্য করে উঠলেন।

এর পর প্রফেসর যেই যানে করে আমাকে পৃথিবীতে পৌঁছে দিলেন। কিন্তু সেই হাসি আজও আমার কাছে এক ক্রন্দনহীন বেদনা হয়ে ঘুরে বেড়ায়, প্রফেসর আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে ছিলেন। কিন্তু আমি কাকে বোঝাব?

23 বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, কলি-5

শেওলা আমাদের বন্ধু

অভিজিৎকুমার দাস

জয়ন্তর আজ খুব আনন্দ। অনেকদিন পর ওর বড় কাকু আসছে কানাডা থেকে। আজ দুপুরে ওর কাকু কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছবে। তাই জয়ন্ত ওর বাবাকে নিয়ে বিমানবন্দরে যাবে বড় কাকুকে আনতে। প্রায় এক বছর বাদে বড় কাকার সঙ্গে দেখা হবে। কি মজাই না হবে! জয়ন্তর বড় কাকু একজন খুব বড় উদ্ভিদবিজ্ঞানী। সারা পৃথিবীতে খুব নামডাক। বিভিন্ন দেশ ঘুরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচার দিয়ে দিয়ে বেড়ায়। বড় কাকু জয়ন্তকে খুব ভালবাসে। বিদেশ থেকে আসার সময় ওর জন্য কত সুন্দর সুন্দর খেলনা ও বই নিয়ে আসে। ওকে নানান দেশের কত মজার মজার গল্প বলে।

তাই জয়ন্ত আজ তাড়াহুড়ো করে স্নান করতে বাথরুমে গেল। কিন্তু, তাড়াহুড়ো করে স্নান করতে গিয়ে বাথরুমে পা পিছলে ধপাস্। পায়ে লাগল চোট, তবে খুব সামান্য। জয়ন্ত দেখলে ওদের বাথরুমের মেঝেতে প্রচুর শেওলা জন্মেছে। আর সেইজন্যই ওর এই অবস্থা। ওর শেওলাদের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে গেল। ও ভাবল এঁদের একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। আগে কাকুকে নিয়ে ফিরে আসি তারপর। জয়ন্ত ইতিমধ্যে স্কুলের পড়া থেকে জেনেছে যে শেওলারা এক ধরনের উদ্ভিদ।

যথাসময়ে জয়ন্ত এবং ওর বাবা কাকুকে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলো। বিকেলে চা-টা খেয়ে কাকুকে নিয়ে একটু বেড়াতে বেরুল। বেড়াতে বেড়াতে জয়ন্ত অনুভব করল ওর হাঁটুর কাছটা একটু চিন্‌চিন্ করে ব্যথা হচ্ছে। বাড়ি ফেরার পর ব্যথাটা একটু একটু করে বাড়তে লাগল। বড় কাকু ওকে খোঁড়াতে দেখে জিজ্ঞেস করল—'কিরে, খোঁড়াচ্ছিস কেন?' জয়ন্ত কাকুকে সব কথা খুলে বললো। কাকু বললো—একটু হলুদ গুঁড়োর সঙ্গে সামান্য চুন আর জল মিলিয়ে লেই তৈরী করে সামান্য গরম করে কয়েকবার প্রলেপ লাগা সব ব্যথা সেরে যাবে। এটা খুব ভালো বেদনানাশক ওষুধ। যে কোনরকম ব্যথা পেলেই এটা লাগাবি। মনে কর বন্ধুদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে নিজেকে কপিলদেব ভেবে ছক্কা মারার জন্যে জোর ব্যাট চালালি। কিন্তু, বল ব্যাটে না লেগে সোজা তোর পায়ে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে আম্পায়ার এল, বি, ডব্লু করে দিল আর পায়ে একটা আলু গজালো। কোন চিন্তা নেই, বাড়ি এসে চুন আর হলুদের প্রলেপ দাও দু' দিনেই ব্যথা ও আলু দুটোই ভ্যানিস্। এবার মাঠে নেমে আর ভুল না করে ছক্কার পর ছক্কা হাঁকাও।

কাকুর কথাগুলো জয়ন্তর খুব ভালো লাগছিল। ও মাকে কাকুর নির্দেশ মতো হলুদ আর চুনের লেই তৈরী করে দিতে বললো। আর কাকুর কাছে বসে কাকুর কথা শুনতে লাগল। কাকু বললো—তুই বাথরুমে পিছলে পড়াতে তোর হয়তো শেওলাদের ওর খুব রাগ হয়েছে এবং ভাবছিস এদের বংশ কিভাবে ধ্বংস করা যায়। কিন্তু এই শেওলারাই আমাদের কত উপকার করে জানিস?

জয়ন্ত বিস্মিত হলো, 'শেওলারা আবার আমাদের উপকার করে নাকি?

—হ্যাঁ উপকার করে বৈকি! এই শেওলারা অর্থাৎ যাদের আমরা শৈবাল বলে জানি এরা আমাদের অনেক উপকার করে। তা হলে শোন, কাকু বলতে শুরু করলো, সায়ানোফাইটা বিভাগের অন্তর্গত নস্টোকেসী শ্রেণীর কিছু কিছু শৈবাল বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে মাটিতে সঞ্চয় করে মাটির উর্বরতাশক্তি বাড়ায়। আজকাল বিজ্ঞানীরা এ জাতীয় শৈবাল দিয়ে ধানক্ষেতের উর্বরতাশক্তি বাড়াতে পেরেছেন এবং ফসলও ভাল হচ্ছে।

ব্যাসিলারিওফাইসী শ্রেণীর শৈবালদের সাধারণতঃ 'ডায়াটম' বলা হয়। এঁদের মৃতদেহ থেকে এক ধরনের মাটি তৈরী হয়। একে বলা হয় 'ডায়াটোমাসিয়াস্ আর্থ'। এই ডায়াটোমাসিয়াস্ আর্থ পালিশের কাজে, ফিল্টার তৈরী করার কাজে, তাপের কুপরিবাহী হিসেবে, টুথপেস্ট ও রং তৈরী করতে এবং ডিনামাইট প্রভৃতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক পদার্থ রক্ষা করার কাজে লাগে।

জয়ন্ত আশ্চর্য হয়ে কাকুর কথা শুনতে লাগলো। কাকু একটু নড়েচড়ে বসে আবার বলতে শুরু করলো, 'তা ছাড়া রোডোফাইটা বিভাগের কিছু কিছু শৈবাল থেকে এক-প্রকার আঠালো পদার্থ তৈরী হয়। এই পদার্থটিকে বলা হয় 'আগার আগার'। এই আগার আগার জেলী, সুপ প্রভৃতি তৈরী করতে এবং পরীক্ষাগারে খুব কাজে লাগে। আমি যখন জাপানে গিয়েছিলাম তখন দেখেছি ওখানকার লোকেরা প্রায় 20 ধরনের শৈবালকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যাণ্ডে দেখেছি 'আলভা ল্যাকটুকা' নামে শৈবাল দিয়ে সুপ এবং স্যালাড তৈরী হয়। 'ল্যামিনারিয়া স্যাকারিনা' এবং 'রোডাইমেনিয়া পামাটা' নামে শৈবালও খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয়। 'কনড্রাস্ ক্রিসপাস্' নামে শৈবালকে জল, দুধ, চিনি এবং কখনো কখনো ফলের রস দিয়ে একপ্রকার খুব সুস্বাদু খাবার তৈরী করা হয়। আহ! খেতে কি স্বাদ!

খাবার কথা শুনে জয়ন্তর জিবে জল এসে গেল। কিন্তু কি আর করা যায়, এখন তো আর সে জিনিস পাচ্ছে না। কাকু বলে চললো—পিঙ্গল বর্ণের শৈবাল 'ম্যাক্রো-

সিস্টস' থেকে 'অ্যালজিন' নামে এক ধরনের আঠা জাতীয় পদার্থ তৈরী হয়। এই অ্যালজিন আইসক্রীম বানাতে এবং রাবার শিল্পে ব্যবহৃত হয়। পিঙ্গল বর্ণের শৈবালে আয়োডিন থাকে। সুতরাং এই শৈবাল গলগণ্ড রোগ সারাতে পারে। 'পোরফাইরা টিনারা' নামে শৈবালও খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই শৈবালে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন B-12 থাকে। 'ক্লোরেল্লা' নামে এক ধরনের শৈবালে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ভিটামিন, অ্যামাইনো অ্যাসিড এবং খনিজ লবণ থাকে। এটা মানুষের পক্ষে খুব পুষ্টিকর খাদ্য। বিজ্ঞানীরা মুরগীর বাচ্চাকে 'ক্লোরেল্লা' খাইয়ে খুব ভালো ফল পেয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন ক্লোরেল্লা খেয়ে মুরগীর বাচ্চারা খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়। বিভিন্ন ধরনের শৈবাল থেকে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য তৈরী চেষ্টা করছেন। শৈবাল দিয়েই হয়তো অদূর ভবিষ্যতে একদিন খাদ্য সঙ্কট দূর করা সম্ভব হবে। মাছেরা কিন্তু বড় হয় শৈবাল খেয়ে। শৈবাল না থাকলে ইয়া পেল্লাই পেল্লাই মাছ আর দেখা যেত না। শৈবাল থেকে অনেক ওষুধ-পত্রও তৈরী হয়। 'ক্লোরেল্লা ভালগার' নামে এক ধরনের শৈবাল থেকে 'ক্লোরেল্লিন' নামে অ্যান্টিবায়োটিক তৈরী হয়। জয়ন্ত ওর কাকুর কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। আর যতই শুনছিল ততই বিস্মিত হচ্ছিল।

ইতিমধ্যে জয়ন্ত হলুদ ও চুনের প্রলেপ হাঁটুতে লাগিয়েছে। এখন ব্যথাটা একটু কম মনে হচ্ছে। বড় কাকু আবার বলতে শুরু করলো—শৈবাল বা শেওলার এত উপকারিতা শুনে তুই আবার বাথরুমের শেওলাগুলোকে জিইয়ে রাখিস না। তা হলে আবার দুর্ঘটনা ঘটবে।

জয়ন্তবললো বারে। মা তো প্রায়ই ঝাঁটা দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে। কিন্তু সব শেওলা পরিষ্কার হয় না যে! বড় কাকু এবার হেসে বললো—ওভাবে পরিষ্কার করলে হবে না। প্রথমে কপার সালফেটের গুঁড়ো অর্থাৎ যাকে আমরা তুঁতে বলে থাকি, জলে ভিজিয়ে বাথরুমের মেঝেতে ছিটিয়ে দিবি। তা হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব শেওলা মরে যাবে। তুঁতে শেওলাদের মেরে ফেলতে পারে। তারপর নারকেলের মালা দিয়ে ঘষে ঘষে তুলে দিবি। ব্যাস সব পরিষ্কার।

কাকুর কাছে এ সব কথা শুনে জয়ন্তর শেওলাদের ওপর যে রাগটা ছিল তা কমে গেল। ও মনে মনে শেওলাদের ভালোবাসতেই শুরু করলো।

চৌধুরীপাড়া, হালিসহর, 24-পরগনা

জেনে রাখা ভালো

চিত্তরঞ্জন রায়

1. কিছু দিন আগে হিন্দী "ধর্মযুগ" পত্রিকায় একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধে লেখক বলেছেন যে এক বিশেষ প্রজাতির কেঁচো ও কিছু দুর্লভ গাছ গাছড়ার শিকড় ও ছালের যৌগিক এবং রাসায়নিক সংমিশ্রণের সাহায্যে খাঁটি চব্বিশ ক্যারেটের সোনা তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। এর পিছনে অর্থব্যয়ও কম। ঐ বৈজ্ঞানিক ও লেখক দাবী করেছেন, এটা তাঁর মৌলিক গবেষণার ফল। বর্তমান দুনিয়ায় কেঁচো বিশেষজ্ঞ বলতে একমাত্র ডঃ জীতেন্দ্র জুলকাকেই বোঝায়। তিনি সম্প্রতি হিমালয়ের লাডাক অঞ্চলে এমন এক প্রজাতির কেঁচোর সন্ধান পেয়েছেন যার দ্বারা দুধ থেকে দই পাতা সম্ভব। যাই হোক এখন ডঃ জুলকার কাছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ জানতে চাইছেন, কোন্ এমন কেঁচো সেটা, যার দ্বারা স্বর্ণ প্রস্তুত করা সম্ভব। পুণা ও মাঙ্গালোর থেকে এই সেদিন দুই জন ধনী ব্যক্তি এসে বলে গেছেন যে অর্থ যতই লাগুক তাতে তাঁরা একটুও চিন্তিত নন কিন্তু কেঁচোর সন্ধান তাঁদের চাই যেমন ভাবেই হোক। কেউ কেউ আবার ডঃ জুলকাকে চিঠি দিয়ে জীবিত কেঁচো পাঠাতে অনুরোধ করেছে।

2. সিরমোর জেলার রেণুকা হ্রদ থেকে মিষ্টি জলের যে সেডুসা (এক প্রকারের জলজ প্রাণী) পাওয়া গেছে তাদের আদি নিবাস আফ্রিকার লেক টাংগানিকা ভিক্টোরিয়া। এতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে হিমালয়ের এই অঞ্চল এক সময়ে মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলো। সিরমোর জেলার রেণুকা হ্রদ ইউ পির সীমানার কাছাকাছি।

3. লাহুল ও স্পিতির একটি তুষারাচ্ছন্ন নদীতে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মাছ পাওয়া গেছে। এরা অনায়াসে বরফের নিচে হিম শীতল জলের মধ্যে থাকতে পারে। আকারে কতকটা আমাদের বাটা মাছের মতো। আকৃতিও ঠিক তেমনি। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে এখানকার নদীর উৎপত্তি স্থল এখানেই। গ্লেসিয়ার থেকে। মধ্য এশিয়ার কোন নদীর সঙ্গে এখানকার নদী-গুলোর কোন যোগাযোগ নেই। মৎস্য বিশেষজ্ঞ ডঃ রাজতিলকের মতে এই মাছ ইউফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর মাছ। এরা সাইপ্রোথোরাসিডি পরিবার ভুক্ত। এদের আরেক প্রজাতি লাডাক, উত্তর কাশ্মীর ও কারগিল অঞ্চলে পাওয়া যায়।

জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ-17

তারকমোহন দাস

সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ সম্পর্কে আমরা এ পর্যন্ত যে সব কথা বলেছি তার মূল বিষয় হল সালোকসংশ্লেষের সময় (1) অক্সিজেন নির্গত হয়। (2) পরিবেশের কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যয় হয়, কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়া সালোক-সংশ্লেষ হতে পারে না। ( ) এই কার্বন ডাই অক্সাইড হাইড্রোজেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে উদ্ভিদ কোষের মধ্যে গ্লুকোজ তৈরী করে—পরে তা স্টার্চ বা শ্বেতসারে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং এই স্টার্চ বা শ্বেতসার তৈরী সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়ার একটি প্রধান লক্ষণ এবং অক্সি-জেনের মত এই বিক্রিয়ার একটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। (4) সালোকসংশ্লেষ বিক্রিয়ায় সূর্য রশ্মির প্রয়োজন হয়, তবে প্রখর কৃত্রিম আলোকেও সালোকসংশ্লেষ হতে পারে। (5) এই বিক্রিয়ায় ক্লোরোফিলের প্রয়োজন হয়, ক্লোরোফিল ছাড়া সালোকসংশ্লেষ হতে পারে না। (6) এই বিক্রিয়ায় গাছের ওজন বাড়ে।

কিন্তু বিজ্ঞানে কোন কথা শুধু বললেই চলবে না, তা উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করতে হবে। আমাদের ছোট ল্যাবরেটারীর মধ্যে নিজের হাতে তোমরা কয়েকটি ছোট ছোট সুন্দর পরীক্ষা করে দেখতে পার সালোকসংশ্লেষ সম্পর্কে আমি যে ছয়টি বিষয়ের কথা বললাম তা সঠিক কিনা। এই পরীক্ষাগুলি করবার সময় ঐ বিষয়গুলি সম্পর্কে আরো খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করবার চেষ্টা কোর। তোমাদের নিজেদের বুদ্ধি খাটিয়ে ঐ পরীক্ষাগুলি বিভিন্ন ভাবে করো।

"সালোকসংশ্লেষের সময় অক্সিজেন নির্গত হয়"—পরীক্ষা করে দেখ কথাটি সঠিক কিনা।

জলজ উদ্ভিদ হাইড্রিলা রয়েছে এমন একটি পুকুর বা ডোবার সন্ধান কর। একটি ছোট কাঁচের গ্লাস বা বীকারের মধ্যে ঐ পুকুরের জল নাও, ঐ জলের মধ্যে হাইড্রিলার ছোট ছোট পাতা (পত্রফলক) কাণ্ড থেকে ছিঁড়ে ডুবিয়ে রাখ, এবং সূর্যের আলোয় গ্লাসটি রাখ। তোমরা অবাক হয়ে যাবে দেখে হাইড্রিলার ঐ ছোট ছোট ছেঁড়া পাতার বৃন্তের গোড়া থেকে কেমন একটি বুদবুদ বেরুচ্ছে, ঐ বুদবুদটি পাতাটিকে সঙ্গে করে নিয়ে তারপর ধীরে ধীরে জলে ভেসে উঠছে, বুদবুদটি বাতাসে মিশে যাচ্ছে, তারপর পাতাটি আবার জলের তলায় নেমে আসছে, এই ভাবে একটি পাতা জলের মধ্যে বারবার ওঠা নামা করছে এবং প্রতিবারই একটি করে বুদবুদ বাতাসে ছেড়ে দিচ্ছে। পাতার এই বুদ্‌বুদ্ তৈরী এবং জলের মধ্যে ওঠানামা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যাবে যদি ঐ কাঁচের পাত্রটি একটি অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিয়ে যাও,—পাতার এই বুদবুদ তৈরীর জন্য যে আলোর দরকার হয় তা এই পরীক্ষা থেকেই প্রমাণিত হবে। কিন্তু ঐ বুদ বুদের মধ্যে কি গ্যাস আছে? সেটা কি করে জানা যাবে? সেটা জানতে হলে হলে তোমার আর একটি ছোট্ট পরীক্ষা করতে হবে।

বিজারিত ইণ্ডিগো কারমাইন (Indigo carmine) দ্রবণ অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলেই গভীর নীল বর্ণ ধারণ করে। একটি কাঁচের পাত্রে 100 গ্রাম কলের জলে 0·01 গ্রাম ইণ্ডিগো কারমাইন ভাল করে যিশিয়ে একটি দ্রবণ তৈরী কর,—দ্রবণটি গভীর নীল রং এর হবে। আর একটি কাঁচের পাত্রে 100 গ্রাম কলের জলে 10 গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইট (Sodium hydrosulphite —$Na_2S_2O_4 2H_2O$) মিশিয়ে আর একটি দ্রবণ তৈরী কর। এখন ইণ্ডিগো কারমাইন দ্রবণের মধ্যে অতি সামান্য পরিমাণ পটাসিয়াম বাইকার্বনেট (0·2%) নাও। এই পটাসিয়াম বাইকার্বনেট জলে কার্বন ডাই অক্সাইড-এর যোগান দেবে যেটা জলজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষে দরকার হবে।

এইবার ইণ্ডিগো কারমাইন দ্রবণের মধ্যে ড্রপারের সাহায্যে ফোঁটায় ফোঁটায় সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইট দ্রবণ যোগ কর, তার ফলে ইণ্ডিগো কারমাইন দ্রবণটি ধীরে ধীরে বিজারিত হবে। সম্পূর্ণ বিজারিত হলে এর নীল বর্ণ দূর হয়ে জলের মত বর্ণহীন একটি দ্রবণে পরিণত হবে। এই ভাবে ইণ্ডিগোকারমাইন দ্রবণটির নীলবর্ণ সম্পূর্ণ দূর হয়ে যখন একটি বর্ণহীণ দ্রবণে পরিণত হবে তখন জলজ উদ্ভিদ হাইড্রিলার ছোট ছোট পাতা ছিঁড়ে তার মধ্যে রাখ এবং পাত্রটি সূর্যের রৌদ্রের মধ্যে রাখ। এইবার লক্ষ্য কর পাতার গোড়া থেকে বুদবুদ বের হলেই তার চার পাশের জল কি রকম নীল বর্ণ ধারণ করছে, ঐ

নীল রং ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, এই ভাবে পাত্রের সব জলই ক্রমশঃ নীল হয়ে উঠবে। বিজারিত ইণ্ডিগোকারমাইন বর্ণহীন কিন্তু অক্সিজেনের সংস্পর্শে জারিত হয়ে নীলবর্ণ ধারণ করে। ঐ বুদবুদের সংস্পর্শে বর্ণহীন ইণ্ডিগোকারমাইন নীল বর্ণ ধারণ করছে' সুতরাং, ঐ বুদবুদের মধ্যে অক্সিজেন গ্যাস আছে,—এই পরীক্ষার সাহায্যে তা প্রমাণ করতে পারবে। পরীক্ষাটি অন্ধকার ঘরের মধ্যে করলে এই নীলরং এর সৃষ্টি হবে না, কোন অক্সিজেন বুদবুদও নির্গত হবে না পাতা থেকে। সালোক-সংশ্লেষের সময় আলোর প্রয়োজন হয় এবং ঐ সময় গাছ থেকে অক্সিজেন নির্গত হয় এই পরীক্ষা থেকে তা বুঝতে পারবে।

তাছাড়া টেস্ট টিউবটি যখন ফানেলের সরু নলের ওপর বসান ছিল এবং টেস্ট টিউবের মধ্যে মথেষ্ট বুদবুদ-এর গ্যাস জমেছিল তখন যদি কিছু পরিমাণ ক্ষারযুক্ত পাইরোগ্যালেট দ্রবণ একটি বাঁকা নলের সাহায্যে টেস্ট টিউবের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতে তাহলে দেখতে সমস্ত টেস্ট টিউবটি সঙ্গে সঙ্গে জলে পূর্ণ হয়ে উঠত। এখানে জানবার বিষয় হল এই ক্ষারযুক্ত পাইরোগ্যালেট দ্রবণ অতি দ্রুত অক্সিজেন গ্যাস শোষণ করে থাকে। সুতরাং পরীক্ষার এই ফলাফল থেকে কি সিদ্ধান্ত করা যায় তোমরাই ভেবে উত্তর দাও।

"সালোকসংশ্লেষের সময় পরিবেশের কার্বন ডাইঅক্সাইড-এর প্রয়োজন হয়, কার্বন ডাই-অক্সাইড শূন্য পরিবেশে সালোকসংশ্লেষ হয় না" —পরীক্ষা করে দেখ কথাটা সঠিক কিনা।

আগের পরীক্ষাটাই তোমাদের এখানে করতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে জলের মধ্যে যেন কোন কার্বন ডাই-অক্সাইড না থাকে। আসলে জলের মধ্যে সব সময়ই কিছু না কিছু কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে কেন না জলের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সহজেই দ্রবীভূত হয়। সেই জন্য আগে জলকে ভাল করে ফুটিয়ে সব কার্বন ডাইঅক্সাইড জল থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে, তারপর জলকে ঠাণ্ডা করে ঐ জল নিয়ে পরীক্ষাটি করতে হবে। কার্বন ডাইঅক্সাইড শূন্য জলে হাইড্রিলা গাছ রাখলে তা থেকে কোনই বুদবুদ বের হবে না, রৌদ্রের মধ্যে রাখলেও নয়। কিন্তু যেই মাত্র সামান্য পরিমাণ (0·2%) পটাসিয়াম বাইকার্বনেট জলে মিশিয়ে দেবে তখনি বুদবুদ বের হতে শুরু হবে, পটাসিয়াম বাইকার্বনেট জলে কার্বন ডাইঅক্সাইড যোগ করার ফলেই এটা ঘটবে।

কার্বন ডাইঅক্সাইড জীবের পক্ষে একটি ক্ষতিকর গ্যাস। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের এটি একটি অপরিহার্য উপাদান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তবুও পরি-বেশের সধ্যে এর মাত্রা অতিরিক্ত হলে উদ্ভিদেরও ক্ষতি হয়ে থাকে এবং সেটাও পরীক্ষা করে দেখান যায়। জলের মধ্যে পটাসিয়াম বাই কার্বনেটের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়ে যাও 0·2% + 0·2% করে এবং সালোকসংশ্লেষের পরিমাপ করো প্রতিমিনিটে বুদবুদের সংখ্যা থেকে। তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাবে প্রথমে কিছুদূর পর্যন্ত পটাসিয়াম বাই কার্বনেটের মাত্রা বাড়ালে সালোকসংশ্লেষের পরিমাণ বাড়ছে ঠিকই কিন্তু তারপরই দ্রুত কমতে শুরু হবে। এবং মাত্র 1% দ্রবণে সালোকসংশ্লেষ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে দেখছ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস একটি নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়ালে উদ্ভিদের পক্ষেও ক্ষতিকর। বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা অতি সামান্য মাত্র 0.03%।

উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ পরিমাপের যন্ত্রটি নিয়ে তোমরা আরো নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে পার, বইতে যেটুকু লেখা আছে বা মাষ্টারমশাই ক্লাশে যেটুকু বলছেন তার মধ্যেই তোমাদের ভাবনা চিন্তা কেন সীমাবদ্ধ রাখবে? তোমরা বুদ্ধি খাটিয়ে আরো নানা রকম পরীক্ষা উদ্ভাবন করতে পারে এবং সালোকসংশ্লেষ সম্পর্কে আরো নানারকম তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, যেমন হাইড্রিলা ছাড়া অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পার। জলজ উদ্ভিদের পরিমাণ বাড়ালে সালোক-সংশ্লেষ বাড়ে কিনা দেখতে পার, জলজ উদ্ভিদের যে অংশে ক্লোরোফিল নেই যেমন শিকড়, ফুল ইত্যাদি সেই সব অংশ নিয়ে পরীক্ষা কর দেখতে পার, বিভিন্ন তাপমাত্রায় সালোকসংশ্লেষ পরিমাপ করে দেখতে পার জল সামান্য গরম করে অথবা জলে বরফ দিয়ে ইত্যাদি।

সালোকসংশ্লেষের এই যন্ত্রটিতে বুদবুদের সংখ্যা গুণতে হয় ঘড়ি ধরে বসে থেকো, তার ওপর ফানেল চাপা দাও, টেস্ট টিউব বসাও অনেক ঝামেলা, আমরা যখন এম-এস-সি ক্লাশে পড়তাম তখন বুদ্ধি খাটিয়ে এমন একটা যন্ত্র তৈরী করেছিলাম যাতে ওসব কোন ঝামেলা নেই। একটা এক-সি-সি পিপেট নিতাম যায় গায়ে 100টি সূক্ষম দানা কাটা থাকত (1 c c Graduated pippette)। এই পিপেটের সরু প্রান্তটির মুখে একটি সরু রবারের পাইপ পরিয়ে দিতাম, এবং একটি পিঞ্চককের সাহায্যে পাইপের মুখটি বন্ধ করে দিতাম। তারপর পিঞ্চককটি সাময়িক ভাবে খুলে পিপেটটি জলপূর্ণ করে নিতাম, তারপর

পিঙ্ককটি বন্ধ করে দিতাম। পিপেটের অপর প্রান্ত দিয়ে একটি তাজা হাইড্রিলার কাটা ডানাটি প্রবেশ করিয়ে দিতাম, হাইড্রিলার অকর্তিত মাথাটি ঝুলত বাইরে। তারপর পটাসিয়াম বাই কার্বনেট যুক্ত বীকারের জলের মধ্যে হাইড্রিলা সমেত পিপেটের প্রান্ত ভাগটি ডুবিয়ে দিতাম এবং একটি স্ট্যাণ্ডের সাহায্যে পিপেটটিকে যথাযথ ভাবে দাঁড় করিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করতাম, রোদের মধ্যে। আর কোন ঝামেলা নেই, দির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পিপেটের মধ্যে কতটা অক্সিজেন জমেছে জল অপসারিত করে তার সরাসরি রিডিং পাওয়া যেত পিপেটের গায়ের দাগগুলি থেকেই। নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর রিডিং নিলেই হল। যন্ত্রটি খুব কাজের হয়েছিল, পরের ব্যাচের ছেলেরাও এটি ব্যবহার করত।

এই পরীক্ষাগুলি শুধু করলেই হবে না, ল্যাবরেটোরী নোটবুকে পরীক্ষার বর্ণনা, তোমার সুবিধা অসুবিধার বর্ণনা, যন্ত্রের ছবি, পরীক্ষার তারিখ তোমার নিরীক্ষার ফলাফল এবং সিদ্ধান্ত সব কিছু গুছিয়ে লিখে রাখতে হবে। একই পরীক্ষা বার বার করে দেখবে ফলাফল একই হচ্ছে কিনা, যদি তফাৎ হয়, কেন তফাৎ হচ্ছে তার কারণ অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করবে, সেগুলিও পরীক্ষার সাহায্যে যাচাই করে দেখবে তোমার ঐ অনুমানে সঠিক কি না। এর পরের সংখ্যায় সালোকসংশ্লেষের অবশিষ্ট পরীক্ষাগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

এই পরীক্ষাটি তোমরা অন্য ভাবেও করতে পার। একটি বীকার জল ভর্তি করে তাতে অতি সামান্য পরিমাণ (0·2%) পটাসিয়াম বাইকার্বনেট মিশিয়ে দাও যাতে জলের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড যোগ হতে পারে। পুকুরের জলে স্বাভাবিক ভাবেই কিছু কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, তাই প্রথম পরীক্ষাটি করবার সময় তাতে পটাসিয়াম বাইকার্বনেট মেশাবার দরকার হয় নি। এখন বীকারের জলের মধ্যে কয়েকটি সতেজ হাইড্রিলার ডগা (5—10 সেন্টিমিটার লম্বা) রাখ এবং তার ওপর একটি ছোট ফানেল চাপা দাও, লক্ষ্য রাখ হাইড্রিলার কাটা প্রান্তগুলি যেন ফানেলের নলের দিদে থাকে এবং ফানেলের সরু নলটি যেন জলের নীচে থাকে। তারপর একটি জলপূর্ণ টেস্টটিউব বুড়ো আঙ্গুলের সাহায্যে মুখটি বন্ধ করে সাবধানে ফানেলের সরু নলের ওপর উপুর করে বসিয়ে দাও। সমস্ত যন্ত্রটিকে রৌদ্রের মধ্যে রাখ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লক্ষ্য কর হাইড্রিলার ডাঁটার কাটা প্রান্ত থেকে অনবরত বুদবুদ বের হচ্ছে। এবং ওপরের দিকে উঠে জল অপসারিত করে টেস্ট টিউবের মধ্যে জমা হচ্ছে। যদি সমস্ত যন্ত্রটিকে অন্ধকারে নিয়ে যাওয়া হয় বা কোন কালো পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখা হয় তাহলে বুদবুদ বের হওয়া সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাবে, যন্ত্রটি আবার রোদে নিয়ে এলে বুদবুদ বের হতে থাকবে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে হাইড্রিলার বুদবুদ বের হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে ঠিকই, কিন্তু ঐ ঘরের মধ্যে যদি একটি অতি জোরাল ইলেকট্রিক ল্যাম্প (500 ওয়াট) হাইড্রিলার কাছে নিয়ে আসা হয় তাহলে আবার বুদবুদ বের হতে আরম্ভ হবে, এই থেকে তোমরা বুঝতে পারবে সূর্যের আলো ছাড়াও জোরাল ইলেকট্রিক আলোয় উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ হয়। সাদা আলো আসলে সাতটি রং এর সমষ্টি মাত্র। এই সাতটি রং এর মধ্যে কোন রং এর আলোয় সালোকসংশ্লেষ ভাল তা জানতে হলে ইলেকট্রিক ল্যাম্পের ওপর এক এক বার বেগুনী, সবুজ, হলদে, লাল, কমলা প্রভৃতি রঙীন সেলোফেন কাগজ জড়িয়ে কয়েকটি মজার পরীক্ষা করতে পার। সালোকসংশ্লেষ ভাল হচ্ছে কি খারাপ হচ্ছে তা বুঝতে হলে ঘড়ি ধরে প্রতি মিনিটে কটা বুদবুদ বের হচ্ছে তা গুণতে হবে। বেশী বুদবুদ বেরলে বুঝতে হবে সালোকসংশ্লেষ বেশী হচ্ছে। কোন রঙের আলোয় বুদবুদ সব থেকে বেশী বেরচ্ছে তা জানতে চেষ্টা কর। এই বুদবুদগুলি টেস্টটিউবের প্রান্তে গ্যাসের আকারে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে জমতে থাকবে, এবং এই গ্যাসটি যে অক্সিজেন তা সহজেই প্রমাণ করা যায়। বুড়ো আঙুলের সাহায্যে টেস্টটিউবের মুখটি বন্ধ করে টেস্টটিউবটি বার করে এনে তার মধ্যে একটি শিখাহীন জ্বলন্ত দেশলাই-এর কাঠি প্রবেশ করিয়ে দিলে দপ্ করে তা আবার জ্বলে উঠবে, অক্সিজেন পদার্থের দহনে সাহায্য করে, তাই এটি দপ্ করে জ্বলে উঠল।

পদার্থে নোবেল পেলেন ডঃ সুব্রহ্মণ্যম, ফাওলার

তপনায়ন ঘোষ

পদার্থ বিদ্যায় 1983 সালের নোবেল পুরস্কার পেলেন একজন ভারতীয় বিশিষ্ট অঙ্কশাস্ত্রবিদ্, পদার্থ বিজ্ঞানী এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ডঃ সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর। চন্দ্রশেখর এখন যদিও মার্কিন নাগরিক, কিন্তু ভারতেই তার জন্ম। সেদিক থেকে তিনি ভারতীয়। চন্দ্রশেখরের সঙ্গে আরেকজন পদার্থবিজ্ঞানীও নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তিনি হলেন উইলিয়ম ফাওলার। তিনিও মার্কিন নাগরিক। এর আগে আরেকজন ভারতীয়-মার্কিন ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। সেদিক থেকে চন্দ্রশেখর দ্বিতীয়। চন্দ্রশেখর এবং ফাওলারের গবেষণার বিষয় ছিল নক্ষত্রের জন্ম, গঠন ও তার বিবর্তন।

চন্দ্রশেখরের সঙ্গে যিনি পদার্থবিদ্যায় যুগ্ম নোবেল বিজয়ী হলেন সেই অধ্যাপক উইলিয়ম ফাওলার। এখন আছেন ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে। চন্দ্রশেখর এবং ফাওলারের গবেষণার বিষয় অবশ্য আলাদা। চন্দ্রশেখরের বিষয় হলো নক্ষত্রের কাঠামো ও বিবর্তনের ভৌত-ধারা ও তার গুরুত্ব। অন্যদিকে ফাওলারের বিষয় ছিল মহাবিশ্বে রাসায়নিক পদার্থ গঠনে পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া।

ডাঃ এস চন্দ্রশেখরের জীবনী ঃ সব থেকে মজার কথা হলো, আজ 19 অকটোবর যেদিনে চন্দ্রশেখরের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করা হলো, 73 বছর আগে ঠিক এই দিনই ছিল চন্দ্রশেখরের জন্মদিন। 1910 সালে তিনি মাদ্রাজে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞান বিশেষতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর তাঁর ভয়ঙ্কর ঝোঁক। কলেজ জীবন কেটেছে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজে।

1930 সালে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম এ ডিগ্রী লাভ করেন। সেই সুবাদে সরকারী বৃত্তি পেয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। 1933 সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি ডিগ্রী পান। 1936 সালে সেখানকার ট্রিনিটি কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন। এরপর তিনি উচ্চতর গবেষণার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন। 1935-38 সালে তিনি চিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহযোগী গবেষক ছিলেন। 1939 সালে সহকারী অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। 1945 সালে তিনি অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। 1952 সালে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতি পদার্থ বিজ্ঞানে প্রধান অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। এখনও তিনি চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একটানা 50 বছর যুক্ত ছিলেন। 1953 সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

1935 সালে যখন তিনি নক্ষত্রের মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বের কথা ঘোষণা করেন তখন সবাই হেসেছিল। চন্দ্রশেখর অবশ্য থেমে থাকেন নি। তিনি তাঁর গবেষণা চালিয়ে যান। নোবেল বিজয়ী ভারতীয় বিজ্ঞানী সি ভি রমন হলেন ডঃ চন্দ্রশেখরের কাকা। তিনিই সবসময় উৎসাহ জুগিয়েছেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে অমূল্য অবদানের জন্য ডঃ চন্দ্রশেখর বিশ্বের বিদ্বৎ সমাজের বহু সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেছেন। 1952 সালে ইংল্যাণ্ডের অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি তাঁকে 'ব্রস' স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেন এবং 1953 সালে রয়েল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি তাঁকে স্বর্ণ পদক দেন। 1952 সালে আমেরিকার আকাদমী অব আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্স তাঁকে রামফোর্ড পদক দিয়ে সম্মানিত করেন। 1962 সালে ইংল্যাণ্ডের রয়েল সোসাইটি তাঁকে ফেলো নির্বাচন করেন এবং রয়েল পদক দেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বই লেখেন অজস্র। জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিগন্তও প্রসারিত হয়। 'চন্দ্রশেখর সীমানা' বলে একটি তত্ত্বও জ্যোতির্বিজ্ঞানে জায়গা করে নেয় পাকাপাকিভাবে। মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেও চন্দ্রশেখর সর্বত্রই তাঁর পরিচয় রেখেছেন ভারতীয় হিসাবে। গত আট বছর ধরে চন্দ্রশেখরের বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের কালো কালো গহ্বরের ওপর গবেষণা চালাচ্ছিলেন।

ভেরোনাই ভরসা

অচ্যুতকুমার সিংহ

হলদিয়ার স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের জীবনকে সুস্থ, সুন্দর ও সফলভাবে গড়ে তোলবার সহায়তায় সম্পূর্ণ সহযোগিতা আর সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে স্থানীয় 'স্বল্প সঞ্চয় সংস্থা ভেরোনা কমার্থিয়াল ক্রেডিট অ্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কোম্পানী লিমিটেড। হলদিয়ার সামগ্রিক অগ্রগতির সঙ্গে সমতা রেখে বিভিন্ন প্রকার গণমুখী প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের পরিপূর্ণ সমর্থনে ও সম্পূর্ণ সহযোগিতায় ভেরোনা প্রায় উল্কার গতিতে এগিয়ে চলেছে এখন। স্বল্প সঞ্চয়ের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রগতিতে বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করতে ভেরোনা সাধ্যমতন সাহায্য করে চলেছে। কারণ ভেরোনা বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে যতটা পরিমাণ টাকা উপার্জন করে ঠিক ততটা পরিমাণ টাকাই সঞ্চয়কারীদের সুরক্ষার নিমিত্ত তারা জাতীয় ব্যাঙ্ক অথবা সরকারী সংস্থায় নিয়োজিত করে সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা করে।

শুধুমাত্র ব্যবসায়িক সাফল্যই বা কেন বলি ভেরোনা হলদিয়ার নানাপ্রকার জনহিতকর কার্যে অথবা নানাবিধ সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যেমন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত তেমনি ভাবীকালের আগামী নাগরিকদের চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রেও তাদের নিয়ত প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। স্থানীয় বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অথবা সাধারণের মূলধন বৃদ্ধিতে এরা যথেষ্ট সাহায্য করে চলেছেন প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে। ভেরোনার সার্টিফিকেট ক্রয়কারী সদস্যরা বিশেষ কতকগুলি আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। যেমন ১০ বছর থেকে ৬৫ বছর বয়সের যে কোন সার্টিফিকেট ক্রয়কারী কোনরূপ অতিরিক্ত ব্যয় ভিন্ন দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে দুর্ঘটনা বীমার সুযোগে, পনের হাজার টাকা অর্জন করিতে পারে তার পরিবার, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানির আনুকূল্যে। হলদিয়ার মধ্যবিত্ত ও অতি নিম্নআয়ের লোকেরা ভেরোনার নানাবিধ সুবিধাজনক ও লাভজনক স্কীমের মাধ্যমে সঞ্চয় করে সত্যিই যথেষ্ট উপকৃত ও লাভবান।

ভেরোনার প্রতিষ্ঠাকালে সংস্থার ম্যানেজিং ডাইরেকটর মিঃ এস গোপী, মিঃ এস দাস, মিঃ এস কে পালিত ও আইন উপদেষ্টা বিশিষ্ট আইনবিদ জি. ঘোষের অবদান অনস্বীকার্য। মেদিনীপুর জেলায় তমলুক সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত বন্দর শহর হলদিয়া আর উপশহর হলদি আর দুর্গাচক। এই দুর্গাচকেই স্থাপিত হয়েছে ভেরোনার রেজিস্টার্ড অফিস এবং এইখান থেকে যাত্রা শুরু করে ক্রমে শহর কলকাতায় প্রধান কার্যালয়টি স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে। গ্রাম থেকে শহরে যাত্রা করেছেন এঁরা—যে ঘটনা সমগোত্রীয় ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম।

VERONA

COMMERCIAL CREDIT & INVESTMENT CO. LTD.

Regd Office :
Durgachak-721602 (Haldia)
Dist.—Midnapur
Phone : DCK-4222

Head Office :
71/1A, Patuatola Lane,
Calcutta-700 009
Phone : 34-2336

স্বপ্ন

মানিকচাঁদ মারোঠী

"লোক না পশু। না না এটা তো সম্পূর্ণ মানুষও নয়, পশুও নয়। জীবটা সত্যিই আশ্চর্য ধরণের তো। জীবটার নিম্নাঙ্গ একেবারে মানুষের মতো অথচ ঊর্ধ্বাঙ্গ নাক, মুখ, দাঁত, চুল সব কিছু একেবারে রাক্ষসের মত। রাক্ষসের মতো মূলোমূলো দাঁত, রাক্ষুসীর মত বিরাট বিরাট চুল। অনুপ এইরকম একটা বীভৎস স্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে লুকোবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঐ কিম্ভুৎ-কিমাকার জন্তুটা তাকে দেখতে পেয়ে তার দিকেই আসতে লাগল। কাছে আসতেই অনুপ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঘুঁষিটা চালিয়ে দিল। পাশেই ভাই সমর ঘুমোছিল। ঘুঁষিটা তার গায়ে লাগাতেই অনুপ অবাক হয়ে দেখে-কই কোথাও তো কিছু নেই, কোথায় সেই বীভৎস আকারের জন্তুটা? সে বুঝতে পারল আসলে সে স্বপ্ন দেখছিল।

শুধু অনুপ কেন, এই দুনিয়ার এমন কোন লোক নেই যিনি কখনও স্বপ্ন দেখেন নি। সকল দেশের সব কালের সমস্ত মানুষই যুগ যুগ ধরে স্বপ্ন দেখে আসছে। বস্তুতঃ স্বপ্ন দর্শনের মতো স্বপ্ন বিশ্লেষণ করার প্রয়াসও মানুষের কত কালের। স্বপ্ন সম্বন্ধে মানুষের কতই না কৌতূহল কত না জিজ্ঞাসা, স্বপ্নের জগৎটা সত্যিই বিস্ময়কর! স্বপ্ন দর্শনের সময় যা মানুষের কাছে জীবন্ত ও বাস্তব বলে মনে হয় স্বপ্ন ফেঙ্গে যাবার সঙ্গে তা চরম মিথ্যা রূপে প্রতিভাত হয়। হঠাৎ সেই স্বপ্নের জগৎটা ভোজবাজীর মতো উবে যায় স্বপ্নকে তখন অলীক বলে মনে হয়। কিন্তু স্বপ্নকে আমরা কি সত্যি অলীক বলে মনে করি। তা হলে সুখ স্বপ্ন দর্শনে এমন ভাবে আনন্দ বোধ করতাম না বা ভয়ংকর স্বপ্ন দর্শনে এমনভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়তাম না। বিশ্বাস করতাম না ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয়? হাতির স্বপ্ন শুভ কিংবা মহিষের অশুভ। আসলে স্বপ্ন সম্বন্ধে এই সমস্ত কুসংস্কার তা সত্যি হোক আর নাই হোক। স্বপ্নকে আমরা সর্বদা অলীকরূপে কল্পনা করতে পারি না, স্বপ্নকে আমরা বিশ্বাস করি ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রূপে। কথিত আছে, মিশরের রাজা ফরোন এক রাত্রে একটা বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন, তিনি দেখলেন নীলনদ থেকে সাতটা হৃষ্টপুষ্ট ও দুগ্ধবতী গাভী উঠে এল, পরক্ষণেই সাতটা রুগ্ন ও দুর্বল গাভী তাদের গ্রাস করল। এক জায়গায় বৃন্তে একটি সাতটি শস্যপুষ্ট মঞ্জুরী দেখা দিল, পরমুহূর্তেই সাতটা শস্যকণাহীন মঞ্জরী তাদের গ্রাস করল। রাজা ফরোন পরদিন প্রাসাদে এসে জানতে পারলেন যে তার স্বপ্নের অর্থ তার জেলে বন্দী জোসেফ নামে এক ব্যক্তি বলতে পারবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে ডেকে তাঁর স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। জোসেফ বলল যে, তার স্বপ্নের অর্থ হচ্ছে তার দেশে প্রথম সাত বছর দারুন ফসল হবে, কিন্তু পরবর্তী সাত বছর খরার দরুন দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। রাজা তার ব্যাখ্যায় চমৎকৃত হয়ে তাকে জেল থেকে খালাস করলেন এবং প্রচুর অর্থ প্রদান করলেন। আশ্চর্য জোসেফের কথাও কিন্তু বর্ণে বর্ণে সত্য হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ স্বপ্নই সত্য, সরল, সুসংবদ্ধ হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা অস্পষ্ট অসংলগ্ন ও অর্থহীন হয়ে থাকে। যেমন আমি একটা স্বপ্ন দেখছি তাতে একটা লোক পাখীর মত আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে অথচ লোকটার ডানা নেই। সুতরাং স্বপ্নটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অর্থহীন। তাই খুব অল্প মানুষই সত্য স্বপ্ন দেখে থাকে। স্বপ্ন সত্যিই দেখি আর মিথ্যাই দেখি প্রশ্ন হচ্ছে আমরা স্বপ্ন দেখি কেন? স্বপ্ন দর্শনের আসল ও বিজ্ঞানসম্মত কারণ এখনও সঠিক রূপে ব্যাখ্যা করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কেননা স্বপ্নের জগৎ খুবই অস্পষ্ট ও রহস্যময়। এখন দেখা যাক এবিষয়ে বিজ্ঞানীরা কী বলেন। ফ্রয়েডের নাম সকলের জানা, তাঁকে আধুনিক মনোজগতের জনক বলা হয়। মনোজগতের বহু রহস্য তাঁর চেষ্টায় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ফ্রয়েডের পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীরা বলেন যে, নিদ্রাকালে শরীরের অসুস্থতা বা অস্বস্তিকর অবস্থাই স্বপ্নদর্শনের মূল কারণ। যদি ব্যক্তির খাদ্যবস্তু ঠিক রূপে জারিত না হয়, কিংবা শয্যাটি কষ্টপ্রদ হয় বা আবহাওয়ার তাপমাত্রা খুব কম বা বেশি হয় বা অন্যকোন অসুবিধা হয় তাহলে শয়নকালে মানুষের মনে বহু অসংলগ্ন ও অলীক চিন্তার উদ্ভব হয় তখন ব্যক্তিটির চেতনা ক্ষীণ ও আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে এবং ঐ অবস্থায় এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলে ভুল করে, অর্থাৎ তখন বাস্তবের পুরোপুরি হুঁশ থাকে না। তার ফলে যে চিন্তাগুলির উদ্ভব হচ্ছিল সেগুলি বাস্তবে ঘটছে না স্বপ্নে দেখছে তা বুঝতে পারে না। এটাকে বিজ্ঞানের ভাষায় আধ্যাষ (Illusion) বলে।

বিজ্ঞানী ফ্রয়েড শত শত স্বপ্নের প্রকৃতি পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, স্বপ্ন মানুষের অপূর্ণ বাসনারাশির পরিপূর্তি ঘটায়। বস্তুতঃ দিবাকালে আমরা যে সব চিন্তা করে থাকি, সে সব ঘটনা আমাদের

মনে দারুন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যে জিনিস মানুষ পাবার জন্যে লালায়িত অথচ বস্তুগুলি সমাজবিরুদ্ধ এবং নীতিবিরুদ্ধ সেই সব ঘটনা সেই সব বস্তু স্বপ্নে আমাদের কাছে বাস্তবে ধরা দিয়েছে বলে মনে হয়। যার ফলে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটা সত্যিকারে পেয়েছি মনে করে আনন্দ বোধ করি। যেমন যে ছেলে কোনদিন গ্রামের বাইরে যায়নি তাদের পরিবারের অন্যান্যদের কাছে শহর সম্বন্ধে কাহিনী গল্প শুনেছে সেই ছেলে স্বপ্নের শহরের রাস্তাঘাট ইত্যাদি দেখতে পেয়ে কৌতূহল মেটায়, আনন্দ উপভোগ করে, প্রবাসী পুত্রের মা স্বপ্নে পুত্রের সাক্ষাৎ পায়। অতৃপ্ত অপূর্ণ বাসনা কামনারাশি, যেগুলি নিয়ে আমরা দিনের বেলা বেশির ভাগ সময় চিন্তিত থাকে সেই সবের প্রতিফলনই স্বপ্নে ঘটে। স্বপ্ন আসলে মানুষের নিদ্রাকে বিঘ্নিত করে। সেইজন্যে বিজ্ঞানী ফ্রয়েড স্বপ্নকে 'নিদ্রার রক্ষক বা অভিভাবক' (Guardian of sleep) বলে অভিহিত করেছেন।

বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ধরণের স্বপ্ন দেখে থাকেন। স্বপ্নের বিভিন্নতা অনুযায়ী বিজ্ঞানী ফ্রয়েড স্বপ্নকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ভাগ করেছেন। এই পদ্ধতিগুলির তিনি নাম দিয়েছেন

(1) প্রতীক পরিনিতি
(2) নাটন
(3) অভিক্রান্তি
(4) সংক্ষেপণ

প্রতীক পরিনিতিতে বিভিন্ন রকম সর্বজনীন প্রতীকের কথা বলা হয়েছে। যেমন রাজা-রানী ভাই-ভগিনী ইত্যাদি অর্থাৎ এই পদ্ধতির স্বপ্ন যে কোন দেশের যে কোন লোকই দেখুক না কেন এই প্রতীকগুলি দ্বারা তারা ঐ সম্বন্ধটিই বোঝে।

নাটন প্রক্রিয়ার স্বপ্নে নাটকের অভিনয়ের মতো প্রচণ্ডতা ও উন্মাদনা থাকে অর্থাৎ চরম নাট্যতা লাভ করে।

অভিক্রান্তির অর্থ যাকে বলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে অর্থাৎ স্বপ্নে এক ব্যক্তি বা বস্তুকে অন্য ব্যক্তি বলে মনে করা। সংক্ষেপণ পদ্ধতিতে বহু ঘটনার বা বহু বস্তুর মিলন ঘটে একটা অদ্ভুত ঘটনা বা বস্তু সৃষ্টি হয়। যেমন মানুষ ও কোন পশু মিলে বীভৎস জীব সৃষ্টি। সে যাই হোক, প্রত্যেক স্বপ্নই অর্থহীন অসংলগ্ন ও জটিল হয়ে থাকে যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। ফলে স্বপ্ন দেখার পরই অধিকাংশ মানুষই স্বপ্নের বেশির ভাগটাই ভুলে যায়, তাই যখন কোন ব্যক্তি কাউকে স্বপ্ন বলতে বা লিখতে যায় তখন সে আপন মনেই বেশ কিছু সংযোজনা করে স্বপ্নটাকে অর্থবহ করে তোলে। একে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে অনুযোজনা।

গুসকরা পি. পি. ইনস্টিটিউশান, বর্ধমান।

সুপার ক্যুইজ কনটেস্ট সমাধান

অধিক সংখ্যায় সঠিক উত্তর দানে সক্ষম সকল প্রতিযোগীদের নাম (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রকাশ করা হল। মানিঅর্ডারযোগে পুরস্কারের টাকা পাঠানো হবে।

প্রথম—জিৎ চৌধুরী, পি/39 লেক ভিউ রোড, কলকাতা-29। দ্বিতীয়—শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, 61 মেন রোড (ইস্ট) নব ব্যারাকপুর, 24 পরগনা 743276। তৃতীয়—জয়ন্তকুমার দে, 1/A/16 অরবিন্দ অ্যাভিনিউ দুর্গাপুর-4, বর্দ্ধমান।

সান্ত্বনা পুরস্কার

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আরও যারা উত্তর পাঠিয়েছে এবং 10 এর বেশী সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছে, তাদের নাম নীচে প্রকাশিত হল। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার তরফে তাদেরকেও একটি করে গ্রন্থ সান্ত্বনা পুরস্কার দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

হুগলী—কৌশিক মুখার্জী, 13, সরোজনাথ মুখার্জী স্ট্রীট, উত্তরপাড়া, হুগলী। আশিসকুমার দাস, মানকুণ্ডু গড়েরধার চন্দননগর, হুগলী।

কলকাতা—সুরজিৎকুমার পোদ্দার, 7 ঢালিপাড়া রোড, বেহালা কলকাতা-60। হীরক বন্দ্যোপাধ্যায় 19/1A কেয়াতলা রোড, কলকাতা-29। সৌমেন রায় C/o, সুধীন্দ্রকুমার রায়, 66/6/5 লেক গার্ডেনস কলকাতা-45। সুজিৎকুমার দত্ত, P 153 D ইউনিক পার্ক। L. P No 78/13/12 বেহালা-34।

২৪ পরগনা—সন্তোষ ঘোষ, 279 দুর্গাবাড়ী রোড, নব ব্যারাকপুর 24 পরগনা। রাজা মুখার্জী C/o, শ্যামাপদ রায়চৌধুরী, সরজিনী পল্লী, বারাসত, 24 পরগনা। সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায় C/o, হারাধনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 39 বিজয়লক্ষ্মী কলোনী নবপল্লী, 24 পরগনা।

বর্দ্ধমান—সাবর্ণ দে, 15 জি. টি রোড ওয়েস্ট লেন ওল্ড ইনকামট্যাক্স পাড়া বর্দ্ধমান 713101।

হাওড়া—জয়নুদ্দীন রঞ্জন চৌধুরী C/o, বিবেকানন্দ রঞ্জন চৌধুরী, 63/B ন্যাশনাল প্লেস বাক্সারা, হাওড়া।

মেদিনীপুর—অভিজিৎ সান্যাল, কোয়ার্টার নং 3/M/3 ইউনিট 4 ওল্ড সেটেলমেন্ট, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

সুপার ক্যুইজ কনটেস্টের সমাধান

1. বাঙ্গালোর 2. স্যার উইলিয়ম লরেন্স ব্র্যাগ। 1915 খ্রীষ্টাব্দে মাত্র 25 বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের এই বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পান। 3. স্টোনফিস। 4. জয়পুর 5. এক ধরণের ক্যাকটাস 6. High fidelity 7. কাচ 8. অ্যাজবেস্টস 9. লাল, নীল এবং হলুদ 10. ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা 11. ছবির একদম শেষে (v) নম্বর Monogramটি 12. ফরাসী দেশ 13. The Swiss Guard. 14. 1937 সালে।

শরীর-স্বাস্থ্য চিকিৎসা বিষয়ক প্রশ্ন

উত্তর দিচ্ছেন ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রশ্ন ঃ (i) অন্ধকারে ঘুম ভালো হয় কেন ?

(ii) ভয় পেলে আমাদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় কেন ?

বাদল মুখার্জি ও সুমন ঘোষ, নিউ কলোনী আনড়া, পুরুলিয়া।

উত্তর (i) ঘুমের সময় যে কোন কারণে স্নায়ু উত্তেজিত হলে সুনিদ্রার ব্যাঘাত হয়। শোবার জায়গায় আলো থাকলে চোখের স্নায়ু উত্তেজিত হতে পারে, তাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে।

(ii) বাহ্যিক গুরুতর কারণে শরীরের একটা অবস্থা হয়, যাকে বলা হয় শক। ভয় পেলে শকের অবস্থা হয় এবং সে সময় ত্বকের শিরা সংকুচিত হওয়ার ফলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। সেজন্য মুখ ফ্যাকাশে দেখায়।

প্রশ্নঃ জনডিস রোগের পূর্ব লক্ষণ কি কি ?

অসিত কুমার দাস, কানাইপুর, কোন্নগর, হুগলী।

উত্তর ঃ জনডিস রোগের পূর্ব লক্ষণ হলো অরুচি, পেটভার, গা ম্যাজম্যাজানি, পেটের ডান দিক ও উপরের দিকে ব্যথা. গা বমি বমি করে, চোখ ও প্রস্রাব হলদে হয়।

প্রশ্ন ঃ আমাদের দেহের কোন স্থানে জোরে আঘাত লাগলে চোখ থেকে দল বেরোয় কেন।

মলয়, আনাড়া, পুরুলিয়া।

উত্তরঃ আঘাত লাগলে চোখের ল্যাকরিমাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরণ হয়, তাই চোখ দিয়ে জল পড়ে।

প্রশ্নঃ খুব বেশিক্ষণ জল ঘাঁটলে হাত পায়ের চামড়া সাদা আর চোখের সাদা অংশ লালচে হয়ে যায় কেন ?

দীপঙ্কর চক্রবর্তী, অভয়নগর হাওড়া।

উত্তর ঃ বেশি জল ঘাঁটিলে শৈত্যের হেতু ত্বকের রক্ত চলাচল ক্ষীণ হয়, ফলে ফ্যাকাসে দেখায়। চোখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে জল লাগায় উত্তেজিত হয়ে রক্ত চলাচল বাড়ে। সেজন্য চোখ লাল দেখায়।

প্রশ্নঃ (i) আমাদের ঘুম পাওয়ার আগে হাই ওঠে কেন ?

(ii) আমাদের হাসি পায় কেন ? সব সময় হাসি কি কি কোন রোগ ?

সুকুমার নাথ, কমলপুর, বাঁকুড়া

উত্তর ঃ (i) ঘুম পাওয়া ছাড়া অন্য সময়েও হাই ওঠে। হাই ওঠার বৈজ্ঞানিক কারণ জানা নেই।

(ii) হাসি পাওয়া আনন্দের অনুভূতির প্রতিবর্ত হিসাবে খুশীর বহিঃপ্রকাশ। হাসির সঙ্গে কোন রোগের সম্বন্ধ নেই। সব সময় হাসতে পারা তো সৌভাগ্যের লক্ষণ।

বিজ্ঞান-সংবাদ

শিশু সাহিত্যে বিদ্যাসাগর পুরস্কার

বিজ্ঞানের কৃতী অধ্যাপক, বর্ষীয়ান ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য এবারে শিশু সাহিত্যে বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেলেন। তোমরা যারা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মিত পাঠক, তাঁর লেখার সংঙ্গে তো আগেই পরিচিত হয়েছে। এই কিছুকাল আগেই শ্রীভট্টাচার্যের ধারাবাহিক বিজ্ঞান ভিত্তিক উপন্যাস কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতায় শেষ হয়েছে।

ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্যের জন্ম বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় ইংরাজী 1909 সালে। পড়াশোনা কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। এম, এস, সি পাস করে প্রথম জীবনে কিছুকাল রিপন কলেজে (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) অধ্যাপনা করেন। পরে দীর্ঘ সময় অধ্যাপনা করেন কলকাতার আশুতোষ কলেজে। আশুতোষ কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করে সম্প্রতি ভবানীপুর এডুকেশন সোসাইটীতে যুক্ত রয়েছেন। ছাত্রজীবনে স্কুলের ম্যাগাজিনে গল্প লিখলেও ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণের প্রথম গল্প প্রকাশিত বার্ষিক শিশুসাথীতে। তখন তিনি, বি, এস, সির ছাত্র। প্রথম ছাপা বইয়ের নাম 'বিজ্ঞান বুড়ো'। তারপর থেকে তিনি ছোটদের জন্য অসংখ্য লিখেছেন। তার সম্প্রতি প্রকাশিত তিনটি উল্লেখযোগ্য বই মেঘনাদ, লুপ্তধন, তুষার লোকের রহস্য।

প্রকৃতি বিজ্ঞানী ডারউইন স্মরণে

নবদ্বীপের বিজ্ঞান চেতনা প্রসার প্রস্তুতি সংগঠনের আহ্বায়ক পরিষদের পক্ষ থেকে চলতি বছরের গোড়ায় নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানী ডারউইনের স্মরণ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। আলোচনা, প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান বিষয়ক পত্র-পত্রিকা প্রদর্শনী, পোষ্টার ইত্যাদি অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত ছিল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মানিক সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক দ্বিজেন সামন্ত এবং প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক সত্য বাগচী।

ডারউইনের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় অনেকে অংশ গ্রহণ করেন।

পত্রপ্রেরকদের কাছে অনুরোধ

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দপ্তরে দৈনিক প্রচুর চিঠি আসে।
সে সব চিঠির বিষয়বস্তুও ভিন্ন ভিন্ন। কেউ বা লেখা পাঠান,
কেউ বা অন্য কিছু। আবার লেখাও ত নানা রকমের।
কেউ পাঠান ছোটদের দপ্তরে প্রকাশের জন্যে।
আবার অনেকে লেখা পাঠান সাধারণ বিভাগে প্রকাশের জন্যে।
লেখা ছাড়াও প্রকাশিত বিষয়ের উপরে অনেকে আলোচনা
করে চিঠি পাঠান, যেগুলি 'চিঠি পত্র' বিভাগে প্রকাশিত হয়।
কেউ বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা রকম প্রশ্ন করে পাঠান—
যার উত্তর ছাপা হয় 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগে। এই
সমস্ত চিঠি খুলে, পড়ে বিভিন্ন দপ্তরে পাঠিয়ে প্রয়োজনীয়
ব্যবস্থা নিতে অনেক দেরি হয়ে যায়।
তাই কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে
আমাদের অনুরোধ তারা যেন চিঠি বা খামের উপরে বিষয়টি
পরিষ্কার ভাবে লিখে দেন। যেমন:
এক কি ধরনের লেখা : ছড়া, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি।
দুই সংশ্লিষ্ট বিভাগের উল্লেখ করা বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা, প্রশ্নোত্তর,
নিজে কর বা ছোটদের দপ্তর ইত্যাদি।
তিন : সাধারণ চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে 'চিঠিপত্র' এবং কোন নির্দিষ্ট
বিষয়ের চিঠি হলে সেই, বিষয়ের উল্লেখ থাকা প্রয়োজন;
যেমন, 'ঘনাদা ক্লাব' ইত্যাদি।
চার : আমন্ত্রিত রচনা বা প্রতিযোগিতামূলক রচনার ক্ষেত্রে সেই
বিষয়ের উল্লেখ খাম বা চিঠির উপরে থাকা প্রয়োজন।
আশা করি কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা
আমাদের সহযোগিতা ক বেন।

—সম্পাদক

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 3rd year · Oct-Nov 1983 Regd No WBCC/50

সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

অমরনাথ রায়
সংখ্যা নিয়ে খেলা — ৮·০০

সমরজিৎ কর
নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১৫·০০ সমুদ্রের সম্পদ ৮·০০

অমরনাথ রায়
জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা — ৫·০০

অরূপরতন ভট্টাচার্য
রোবোট এল কেমন করে — ৬·০০

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার — ৬·০০

অমরনাথ রায়
সায়েন্স ক্যুইজ — ১০·০০

সিদ্ধার্থ ঘোষ
স্যাম লয়েড ও ল্যুইস ক্যারোলের ধাঁধা — ১০·০০
অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক — ৬·০০

বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞানের গল্প

লীলা মজুমদার
কল্পবিজ্ঞানের গল্প — ১৫·০০

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
লুপ্তধন ৮·০০ মেঘনাদ ১০·০০

অদ্রীশ বর্ধন
কিশোর সায়েন্স ফিকশ্যান — ১৫·০০

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
তুষারলোকের রহস্য — ৮·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮/১এ শ্যামা... ত, কলকাতা–৭০০০৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামা...
এবং ৬ শিব বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রি...
প্রচ্ছদমুদ্রণ রূপসা এন্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি...